বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল

তপন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল

তপন চক্রবর্তী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No. 17933
Date 10-6-04

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৪০৫ / নভেম্বর ১৯৯৮

বাএ ৩৮২৭
(৯৮–৯৯ ভাসাসপ : ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ ৪)

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক
আজহার ইসলাম ভূঁইয়া
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

BANGLADESHER BON O BONANCAL [Forests and Woodlands of Bangladesh] by Tapan Chakraborty. Published by Azhar Islam Bhuiyan, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : November 1998. Price : Taka 55.00 only.

ISBN-984-07-3836-4

প্রসঙ্গ কথা

আমার ঘরের আশেপাশে যে সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা। তার ইশারা নিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের সাড়ায়...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯৫ সালের মাঝমাঝি এন.সি.এস. বাস্তবায়ন প্রকল্পের (National Conservation Strategy Implementation Project) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মী জনাব রেজা সেলিম আমাকে ফোনে বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল বিষয়ক একটি বই লেখার অনুরোধ জানান। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে সময় চেয়ে নিই। কারণ, এ বিষয়ে লেখার দুঃসাহস করি কি করে! গাছপালা, বন ও বনাঞ্চলের ব্যাপারে আমার কৌতূহল আছে, পরিবেশ বিষয়ে আমার নানান রচনায় পৃথিবী ও জীবকূলে বৃক্ষ ও অরণ্যরাজির বিচিত্র অবদানের আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আমার আনুষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, কোনো অভিজ্ঞতাও নেই।

কিছুদিন পর। কবি অসীম সাহার 'ইত্যাদি'-তে বসে আড্ডা দিচ্ছি। প্রকল্পের পরিচালক মনজুরুল হান্নান খান ও রেজা সেলিম সরাসরি সেখানে এসে আমায় জোর অনুরোধ জানান এবং একটি চিঠিও হাতে দেন। আমি অগত্যা রাজী হই। বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করি। আই.ইউ.সি.এন. (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)-এর কর্মকর্তা জনাব রশীদুজ্জামানের সহায়তায় তাঁদের গ্রন্থাগারে প্রায় তিন মাস পড়াশোনার সুযোগ পাই। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু একটা বই দাঁড় করানোর মতো তথ্য পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয় দাঁড়ায়। পিঁপড়ার মতো একটু একটু করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বইয়ের খসড়া নির্মিত হয়।

১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর প্রকল্প থেকে বইয়ের সূচির খসড়া পরিকল্পনা পেশ করার অনুরোধ জানানো হয়। প্রশ্ন করলাম কেনো? পাণ্ডুলিপিই তো পেশ করতে পারি। মনজুরুল বললেন-'স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা, কমিটিতে পাশ করিয়ে নিতে হবে।' দিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন খবর নেই। বছরের শেষে মনজুরুলকে ফোন করি। জানা গেল তখন তিনি বিদেশে। তাঁর

সহকর্মী জানালেন যে কমিটির বৈঠকে আমার খসড়া পরিকল্পনা খুব প্রশংসিত হয়। কিন্তু কাজটি দেওয়া হয় অন্যকে। আমি অবাক হইনি, দুঃখও পাইনি। বরং তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। ওরাঁ জোর না করলে বইটি তো লেখা হতো না।

এ সকল ঘটনা জানতেন স্নেহভাজন ফরহাদ খান। তিনি বইটি বাংলা একাডেমীতে জমা দেবার পরামর্শ দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় বাংলা একাডেমীর পরিচালক বন্ধুবর আজহার ইসলামের জোর সমর্থনে এবং ভাসাসপ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বইটি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হলো। আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী। ঋণী আমি রশীদুজ্জামান ও অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। পাণ্ডুলিপি সুষ্ঠুভাবে তৈরি করায় এবং কতিপয় অংশের সংযোজনে অপরেশ যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কিশোর বয়সে খনার বচন "কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত" পড়ে বৃক্ষজীবন ও বৃক্ষের অবদানের ব্যাপারে মনে ঔৎসুক্য জাগে। ঔৎসুক্য বৃক্ষ সম্বন্ধে জানার প্রেরণা জোগায়। স্বীকার করি, এই বই লেখার জন্য ওই ঔৎসুক্য ও স্বল্প জানা যথেষ্ট নয়। তাই তথ্যগত ও উপাত্তগত প্রমাদ থাকতে পারে। প্রমাদ নিরাময়ে পাঠকের প্রেসক্রিপশন জরুরি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে পাঠকের পরামর্শ গ্রহণ করবো।

ঢাকা ২৬.১০.৯৮

তপন চক্রবর্তী

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায় : বন ও বনাঞ্চল ১৩-২৮

১. বন ও বনাঞ্চল বলতে কি বুঝায়
২. বনের জন্মকথা
৩. বনাঞ্চলের সৃষ্টি
৪. বৃক্ষের মূল্য
৫. বন ও মানুষের সম্পর্ক
৬. পৃথিবীর বনবনানী

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের বনবনানী ২৯-৫৩

১. বনের শ্রেণিবিভাগ
২. অতীত ও বর্তমান বনাঞ্চল
৩. খোলাবন বা শালবন
৪. মৌসুমী বা মিশ্র পাতাঝরা বনাঞ্চল
৫. গ্রামীণ বন
৬. অশ্রেণিভুক্ত বন
৭. ম্যানগ্রোভ বা গরান বন

তৃতীয় অধ্যায় : বন ও বনাঞ্চলের অবদান ৫৪-৭১

১. সম্পদের অফুরন্ত উৎস
২. বস্তুগত সম্পদ সরবরাহ :
জ্বালানি কাঠ ; গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্যে কাঠ, বাঁশ বেত, লতা ; মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য ; মাছের আহার ; শিল্পের কাঁচামাল ; এবং ভেষজ
৩. পরিবেশে বন ও বনাঞ্চলের অবদান :
বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও তাপ-এর সমতা রক্ষা ; বন্যা ও প্লাবনরোধ ; ভূমির ক্ষয়রোধ ; ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসরোধ ; বায়ু বিশুদ্ধকরণ ; শব্দদূষণরোধ ; মরুবিস্তার রোধ ; ধুলোবালি ও দুর্গন্ধ দূরীকরণ ; পশুপাখির আশ্রয়স্থল ; এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায় : বন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ ৭২-৭৭

১. জনসংখ্যাবৃদ্ধি
২. বাঁধ, রাস্তা ও জলাধার নির্মাণ
৩. নদীর ভাঙন ও নদীতলের স্ফীতি
৪. গোচারণ
৫. জুমচাষ
৬. চিংড়িচাষ
৭. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৮. কীটপতঙ্গের আক্রমণ
৯. রাসায়নিক দূষণ
১০. তেলদূষণ

পঞ্চম অধ্যায় : বন ও বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী ৭৮-৮১

১. গ্রামাঞ্চলের উদ্ভিদ
২. প্রাকৃতিক বনের উদ্ভিদ
৩. বনাঞ্চলের প্রাণী

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের বননীতি ও বিধিবিধান ৮২-৮৪

সপ্তম অধ্যায় : সামাজিক বনায়ন ৮৫-৯১

১. ভূমিকা
২. প্রয়োজনীয়তা
৩. সামাজিক বনায়নের প্রকারভেদ
(১) কম্যুনিটি বনায়ন ;
(২) গ্রামীণ বনায়ন ;
(৩) অংশীদারিত্ব বনায়ন ;
(৪) নগর বনায়ন ;
(৫) কৃষি-সম্পৃক্ত বনায়ন ;
(৬) বাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন ; এবং
(৭) অবাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন

অষ্টম অধ্যায় : বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ৯২-৯৪

১. রোপণ পদ্ধতি
২. রোপণের স্থান
৩. পরিচর্যা

নবম অধ্যায় : বন সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনা ৯৫-৯৮

১. জনগণ ও সরকারের ভূমিকা
২. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

তথ্যপঞ্জি ৯৯-১০০

প্রথম অধ্যায়

বন ও বনাঞ্চল

রাজনীতিতে অজানা ভবিষ্যতে স্থায়ী ও নিরাপদ কাল্পনিক রাজ্যসৃষ্টির দৃঢ় প্রত্যয়ে অহিফেনসেবীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে লক্ষ প্রাণের বলিদানের জন্য আমরা প্রস্তুতি নেই।

কিন্তু যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রশ্ন আসে সেখানে চুলচেরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার যোগ্য তুচ্ছ ভবিতব্যকে বর্তমানের লালসা মেটাতে উৎসর্গ করি। যেমন, আমরা জানি যে, যদি আমরা ভূমির অপব্যবহার করি তাহলে ভূমি উর্বরতা হারাবে। যদি আমরা বন ধ্বংস করি তবে আমাদের ভাবী প্রজন্ম কাঠের সংকটে পড়বে এবং দেখতে পাবে যে তাদের উচ্চভূমি ক্ষয়ে গেছে ও উপত্যকা বন্যায় ভেসে গেছে। তবু, আমরা ভূমির অপব্যবহার ও বনাঞ্চল ধ্বংস করে চলেছি।

এক কথায়, ভবিষ্যতের যে সকল জটিল ব্যাপারে প্রাক ধারণা করা অসম্ভব, সেখানে আমরা আমাদের বর্তমানকে বিসর্জন দিচ্ছি ; অথচ তুলনামূলকভাবে বিচার-বিবেচনা করলে, প্রকৃতি বিষয়ক সহজ সরল ব্যাপারে, যেখানে কি হতে পারে তা আমাদের জানা আছে, সেখানে আমরা ভবিতব্যকে বর্তমানের কাছে বলি দিচ্ছি।

আলডুস হাক্সলী

১.১. বন ও বনাঞ্চল বলতে কি বুঝায়

ইংরেজি ফরেস্ট (forest) শব্দের বাংলা অর্থ বন। ফরেস্ট্রি (forestry) অর্থ বনাঞ্চল বা বন বিষয়ক বিজ্ঞান। ল্যাটিন ভাষার ফরিস *(foris)* শব্দ থেকে ফরেস্ট শব্দের উৎপত্তি।

সাধারণত গ্রামের বা লোকবসতির বাইরের ভূমি বা যে ভূমিতে চাষাবাদ হয় না সেই ভূমিকে বন বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমিকেও বন বলা হচ্ছে। এই ভূমিতে গাছ, লতা, গুল্ম না-ও থাকতে পারে। আমাদের দেশে বনকে জঙ্গলও বলা হয়ে থাকে। যে ভূমিতে গাছপালা, ঝোপঝাড় থাকে তাই-ই জঙ্গল। তবে এ সকল ভূমিতে গাছপালা এলোমেলোভাবে জন্মায়। সাধারণ অর্থে কাঠসহ অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত এলাকার নাম বন। অথবা পরোক্ষভাবে উপকার সাধিত হবার নিমিত্তে গাছপালা গড়ে তোলা হলে সে অঞ্চলকেও বনভূমি বলা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষণ ও

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে বনাঞ্চল পরোক্ষে মানবজাতির উপকার সাধন করে। বনে গাছপালা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনজ সম্পদ আহরণ ও বনজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের তত্ত্বকে বনাঞ্চল বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

১.২ বনের জন্মকথা

প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন গাছপালার সমাবেশে গড়ে উঠে একটি বন। প্রকৃতি বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় গাছপালার প্রকারও। অর্থাৎ বন সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যায়ে যে ধরনের উদ্ভিদ থাকে, কিছুদিন পর ধীরে ধীরে অন্য ধরনের উদ্ভিদ বা গাছ এসে বনের বাসিন্দা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরনো বাসিন্দা বদলে যায়, জায়গা করে নেয় নূতন নূতন অতিথি বা বাসিন্দা। এর ফলে বনের প্রাথমিক বাসিন্দা, যাদের পাইওনিয়ার রেসিডেন্ট (pioneer resident) বলা হয়, তারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। এভাবে একের পর এক নূতন ধরনের বা জাতের উদ্ভিদ এসে পুরনোদের স্থান দখল করে নিতে থাকে। নানা জাতের পাছপালার একে একে এই যাওয়া আর আসাকে উদ্ভিদ পর্যায়ক্রম (succession) বলা হয়ে থাকে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। তবে একটা পর্যায় আসে যখন এই আসা-যাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। এই শেষ পর্যায়কে চূড়ান্ত দশা বা পর্যায় (climax condition) বলা হয়। এই অবস্থায় এসে উদ্ভিদের এই পর্যায়ক্রম থেমে যায়। সৃষ্টি হয় একটি স্থায়ী বনভূমি বা বনাঞ্চলের।

সাধারণভাবে একটি ধারণা প্রচলিত যে বন যেখান-সেখানে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এর পেছনে আদৌ কোন সত্যতা নেই। বন যেকোন স্থান থেকে গড়ে উঠতে পারে না। বন সাধারণত দুই প্রকার স্থান থেকে সৃষ্টি হয় বা গড়ে ওঠে। যেমন, প্রথমত, বিস্তীর্ণ জলাশয় থেকে এবং দ্বিতীয়ত, অনুর্বর মরুভূমি থেকে।

জলাশয় থেকে সাধারণত যে ধরনের বন সৃষ্টি হয়, তাকে 'জলসিড়ি' বলা হয়। অন্যদিকে মরুভূমি থেকে যে ধরনের বন সৃষ্টি হয়, তাকে 'মরুসিড়ি' বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের প্রাধান্যকে ভিত্তি করে বন সৃষ্টিকালে উদ্ভিদের পর্যায়ক্রমকে বিভিন্ন ধাপে ভাগ করা হয়েছে। জলাশয় থেকে এক ধরনের গাছপালা জন্মায়। অন্যদিকে মরুভূমির বুকে জন্মায় সেখানকার পরিবেশের পক্ষে উপযোগী নানা ধরনের এবং নানা জাতের উদ্ভিদ। মূলত একারণে কোন সুনির্দিষ্ট এলাকার বন বা গাছপালার বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করা তেমন সহজ কাজ নয়।

জলাশয় থেকে বন নানাভাবে বিস্তৃত হতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই এসব বনের বাসিন্দাদের গঠন বা আকৃতিগত নানা ধরনের পরিবর্তন হতে পারে। নিচে এসব পর্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে—

১.২.১. নিমজ্জিত ভাসমান পর্যায় : যে সব জলাশয়ের জলের গভীরতা ২০ ফুট বা গড়ে ৬ মিটারের চেয়ে কম, সেখানে কিছু প্রজাতির শিকড়যুক্ত উদ্ভিদ জন্মায়। এসব উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে পাতাশেওলা, পোটামোগেটন *(Potamogeton)*, কারা *(Chara)*, নিটেলা *(Nitella)*, র‍্যানানকুলাস *(Rananculus)*, ইলোডিয়া *(Elodea)*, ইউট্রিকুলারিয়া *(Utricularia)*, ইত্যাদি।

জলের স্বচ্ছতা এবং উদ্ভিদ প্রজাতির উপর নির্ভর করে এসব উদ্ভিদ বিভিন্ন গভীরতায় জলাশয়ের কাদাযুক্ত বা বালুকাময় তলদেশে জন্মায়। গাছগুলো মরে যাবার পর সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং জলাশয়ের তলদেশে জমা হয়। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে এসব উদ্ভিদের পচনক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। এভাবে মৃত জলজ উদ্ভিদের হিউমাস জমে জমে জলাশয়ের তলদেশকে ভরাট করে দেয় বা দিতে পারে। এই অবস্থা নিমজ্জিত ভাসমান উদ্ভিদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এসব উদ্ভিদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ধরনের গাছপালা জন্মাতে শুরু করে।

১.২.২. ভাসমান পর্যায় : এই পর্যায়ে জলাশয়ের জলের গভীরতা ৬ থেকে ৮ ফুট বা ১.৮ থেকে ২.৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ভাসমান উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির পাতা জলের উপর ভেসে থাকে এবং জলে তাদের শিকড় নিমজ্জিত অবস্থায় অনেকটা ঝুলে (suspended) থাকে। এই ধরনের উদ্ভিদের মধ্যে পানিফল, কচুরিপানা, অ্যাজোলা *(Azolla)*, স্পাইরোডেলা *(Spirodella)*, লেমনা *(Lemna)*, উলফিয়া *(Wollfia)*, স্যালভিনিয়া *(Salvinia)*, পিস্টিয়া *(Pistia)*, লিমনেনথিমাম *(Limnenthimum)* ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদের পাতা জলের উপরিভাগকে ঢেকে রাখে। এর ফলে জলাশয়ের তলদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো পৌঁছাতে পারে না। এতে নিমজ্জিত ভাসমান উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হয়। এর ফলে এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমতে থাকে। ভাসমান উদ্ভিদের ঘন সমাবেশের কারণে জলাশয়ের জলবাহিত মাটি বা পলি ক্রমান্বয়ে জমতে থাকে। এই পলি জমাটকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। এতে জলাশয়ের জলের গভীরতা খুব দ্রুত কমতে থাকে, যা ভাসমান উদ্ভিদের জন্ম এবং বৃদ্ধির জন্য অনুপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যায়ে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়, যা নলখাগড়াজাতীয় উদ্ভিদের জন্য উপযোগী হয়ে দাঁড়ায় এবং সুযোগ বুঝে ভাসমান উদ্ভিদের এলাকায় নলখাগড়াজাতীয় উদ্ভিদ জন্মাতে থাকে। ক্রমশ ভাসমান উদ্ভিদের স্থান নলখাগড়াজাতীয় উদ্ভিদের দখলে চলে যায়।

১.২.৩. নলখাগড়াসহ জলাভূমি পর্যায় : এই পর্যায়ে জলাশয়ের জলের গভীরতা খুব কমে যায় এবং এক পর্যায়ে জলাশয়ের জলের গভীরতা কমে দাঁড়ায় ১ থেকে ৪ ফুট বা ০.৪ থেকে ১.৩ মিটারের কাছাকাছি। এসব এলাকায় গাছের শিকড়, মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গাছের পাতা জলের উপর ভেসে থাকে। এই ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো কলমিশাক, কচু, চিড়চিড়ি, বনপাল, মুথাঘাস, মনোক্যারিয়া *(Monocaria)*, লুডমিজিয়া *(Ludmizia)*, ফ্যাগমাইটিস *(Phagmytis)* ইত্যাদি এ ধরনের গাছ। এই পর্যায়ের গাছপালা জলের উপর ছায়া বিস্তার করে। এছাড়া পলিমাটি ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ধরে রেখে জলাশয়ের তীরবর্তী এলাকাও গড়ে তোলে। এভাবে জলের গভীরতা আরো কমে যায়। তখন নলখাগড়াজাতীয় উদ্ভিদের জন্য পরিবেশ অনুপযুক্ত হলেও পরবর্তী পর্যায়ের গাছপালার জন্য এ অবস্থা সুবিধাজনক হয়ে যায়।

১.২.৪. লতাজাতীয় ঘাস-আবৃত ভূমি : এক থেকে কয়েক ইঞ্চি বা ২.৫ সেন্টিমিটার থেকে ১২.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত জলের গভীরতায় এই পর্যায়ের গাছপালার পর্যায়ক্রম চলতে

থাকে। পুদিনা, হেলেঞ্চা, পলিগোনাম *(Polygonum)*, ক্যাপনেনুলা *(Kepnenula)* ইত্যাদি উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার লতানো ঘাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় জন্মায়। জলাশয়ের জল কমতে কমতে যখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে জলাশয়ে আর কোন জলই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এসব উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে সংযুক্ত জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। জল আরো শুকিয়ে যাবার পর জলপ্রিয় লতাজাতীয় ঘাসের জীবনধারণ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় জলবায়ু বিশুষ্ক হলে পরবর্তী পর্যায়ে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্যাঁতসেঁতে জলবায়ুতে এমন সব গাছপালা জন্মায়, যাতে লতানো ঘাস দিয়ে আবৃত ভূমি অরণ্যভূমিতে পরিণত হয়।

১.২.৫. অরণ্যভূমি পর্যায় : এই পর্যায়ের জলাবদ্ধ ভূমিতে এমন সব বড় বড় গাছ বা উদ্ভিদ জন্মায়, যারা জলাবদ্ধ ভূমিতে আবদ্ধ জমাট-বাঁধা জলজ পরিবেশ সহ্য করতে পারে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে স্যালিক্স *(Salix)*, উলমাস *(Ulmas)*, একাশিয়া *(Acacia)*, ইরিথ্রিনা *(Erythrina)*, ইত্যাদি গাছ প্রধান। এসব গাছের সঙ্গেই ছায়াপ্রিয় কিছু ফার্নজাতীয় (Fern) গাছ জন্মায়। এ পর্যায়ে মাটিতে আবদ্ধ জল আরো হ্রাস পায় এবং ক্রমান্বয়ে এই নূতন প্রজাতির গাছ এদের স্থান দখল করে নেয়।

১.২.৬. চূড়ান্ত বনভূমি : মাটির মধ্যে আবদ্ধ জল ক্রমশ শুকাতে থাকলে এবং বনভূমির গাছপালার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে যে হিউমাস (humus) তৈরি হয়, তাতে এই এলাকার বনভূমি ক্রমান্বয়ে মিশ্র বনের উপযোগী হয়ে ওঠে। অধিক সংখ্যক বড় আকারের গাছ জন্মানোর ফলে বনভূমি ক্রমশই ঘন হয়ে ওঠে। বনভূমি যতোই গভীর ও ঘন হতে থাকে, বনে ততোই ছায়ার বিস্তার বাড়তে থাকে। এই ছায়ার ক্রমবিস্তার ক্রমে ক্রমে বনভূমিতে ছায়াসহিষ্ণু ঝোপঝাড়েরও বিস্তার ঘটায়। বিভিন্ন গাছের সংমিশ্রণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মোটামুটিভাবে স্থায়ী বনভূমির সৃষ্টি হয়ে যায়। এই অবস্থায় মূলত মাটির প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। আর এর ফলেই বনের গাছপালার রকমভেদে একপ্রকার স্থায়িত্ব এসে যায়। সৃষ্টি হয় বনের।

১.৩ বনাঞ্চলের সৃষ্টি

পৃথিবী সৃষ্টির পর এক পর্যায়ে এর বড় অংশেই ছিলো ঊষর ভূদৃশ্যাবলি। গ্রহটি ঠাণ্ডা হওয়ার সময় এর পৃষ্ঠভাগে সৃষ্ট আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কোনো উপমা আমরা আজ দিতে পারবো না। এমনকি কল্পনাও করা যাবে না। তখন পৃথিবী ভস্ম ও লাভার আস্তরণে ঢাকা। পরবর্তীকালে কোটি কোটি বছর ধরে বাতাস ও বৃষ্টি পর্বতগুলোকে ক্ষয় করছিলো। সেসময় পৃথিবীতে সমতলভূমি ছিলো নগণ্য। পর্বতের শিলা ক্ষয় হয়ে কাদা ও মাটি সৃষ্টি করতে থাকে। স্রোতপ্রবাহ কাদা ও মাটি বয়ে নিয়ে সমুদ্রের তলায় জমা করে। ভস্ম, কাদা, মাটি সব মিলে কোমল শিলা ও বেলে পাথরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর গভীরে সৃষ্ট তরল প্রবাহের দরুন মহাদেশগুলোও স্থির ছিলো না। মাঝে মাঝে মহাদেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষও হচ্ছিলো। এতে মহাদেশের পৃষ্ঠদেশের পলির আস্তরণ সংকুচিত হয়ে পলিতে ভাঁজ পড়ে। এই ভাঁজগুলো নূতন পর্বতমালার সৃষ্টি করে। ৩০০ কোটি বছর ধরে এই ভাঙাগড়ার পালা চলতে থাকে। এর পর সমুদ্রে জীবের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু স্থলভাগ তখনো জীবহীন ঊষর।

কিছু সামুদ্রিক শৈবাল, নিঃসন্দেহে, সমুদ্রের কিনারে বেলাভূমি বা উপলখণ্ডকে সবুজের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে বাঁচার সংস্থান করেছিলো। কিন্তু এরা জলপ্রান্ত থেকে খুব দূরে বিস্তৃত হতে পারেনি। কারণ ডাঙায় ওরা জলের অভাবে শুকিয়ে যেতো। ৪০০ কোটি বছর আগে কোনো কোনো শৈবালে মোমের আবরণের মতো ত্বকের সৃষ্টি হয়। এই ত্বক শৈবালকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এরপরও শৈবাল জলের আশ্রয় ছাড়তে পারেনি। কারণ প্রজনন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যে শৈবাল জলের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো।

আজো টিকে থাকা আদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা রয়েই গেছে। লিভার উর্ট (Liverwort) নামের উদ্ভিদের ভেজা ত্বক ও শৈবাল বা মস (Moss)-এর সবুজ আঁশ দ্বারা আবৃত নলাকৃতির দেহের জন্যও জল অপরিহার্য। এরা জনুক্রমের (alternation in generations) মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। অর্থাৎ যৌন ও অযৌন দুই উপায়ে ওদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। বর্তমানের সবুজ শৈবাল যৌনকোষ উৎপাদন করে। শৈবালের কাণ্ডের শীর্ষে ডিম্বাণু সংলগ্ন থাকে। শৈবাল শুক্রাণুকে বিমুক্ত করে জলে। জলে সাঁতার কেটে শুক্রাণু কাণ্ডশীর্ষে থাকা ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং ডিম্বকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম্ব মাতা বা পিতা শৈবালের দেহের সঙ্গে তখনো যুক্ত থাকে। নিষিক্ত ডিম্ব গজায় এবং এর কাণ্ডে সৃষ্টি হয় একটি ক্যাপসুলের (Capsule) মতো অঙ্গ। ক্যাপসুলের ভিতরে সৃষ্টি হয় অসংখ্য স্পোর (Spore)। শুকনো আবহাওয়ায় ক্যাপসুল বড়ো হয়ে ফেটে যায় এবং স্পোর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস স্পোর বয়ে নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দেয়। অনুকূল আবহাওয়ায় ভিজা মাটিতে স্পোর নূতন শৈবালের জন্ম দেয়।

মসের বা শৈবালের দেহ নলাকৃতির। খুব মজবুতও নয়। উচ্চতা মোটামুটি। এরা খুব ঘন হয়ে জন্মায়। ফলে পরস্পর পরস্পরে গায়ে গায়ে ঠেকনা দিয়ে খাড়া থাকে। দেখতে মনে হয় সবুজের গালিচা। দেহ নরম, কোষ জলভেদ্য ও জলপূর্ণ। এ জন্যে শৈবাল দৃঢ় ও মজবুত নয়। আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে এই ধরনের উদ্ভিদই সম্ভবত স্থলভাগের স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলসমূহ দখল করেছিলো। তবে পুরনো পৃথিবীর শিলাস্তরে এদের অস্তিত্বের প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায় নি। যেটুকু জানা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ৪০০ কোটি বছর আগে স্থলভাগে যে সকল উদ্ভিদ ছিলো, তাদের দেহ ছিলো সরল ও পাতাহীন। তবে এদের শাখা ছিলো। শৈবালের মতো সরল মূলও ছিলো না। কাণ্ডে লম্বাটে, পুরু প্রাচীর ঘেরা কোষ ছিলো। কোষ উদ্ভিদদেহে জল সঞ্চালন করতো। তুলনামূলকভাবে মস বা শৈবালের চেয়ে এদের দেহ দৃঢ় ও মজবুত ছিলো। কয়েক মিটার উঁচু এ সকল উদ্ভিদ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো কোনো অবলম্বন ছাড়াই। এই সকল তথ্য খুব নির্ভরযোগ্য না হলেও উদ্ভিদজগতে বড়ো ধরনের অগ্রগতি যে হচ্ছিলো এবং অরণ্যভূমি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছিলো তা বোঝা যায়। আদি শৈবাল, লিভার উর্টের অনুরূপ আকার, আকৃতি ও প্রকৃতির উদ্ভিদসমূহ নদী ও নদীর মোহনা থেকে স্থলভাগের কিছুটা ভিতর পর্যন্ত সবুজ গালিচা বা প্রাথমিক অণু-অরণ্যেই পত্তন ঘটিয়েছিলো। সমুদ্র থেকে উঠে আসা প্রাণীরা প্রথমে এই অরণ্যে বসতি শুরু করে এবং ক্রমে কলোনি গড়ে তুলে।

প্রথমদিকের দেহখণ্ডসম্পন্ন প্রাণীসমূহ যখন আর্দ্র আবহাওয়া পরিত্যাগ করে স্থলচর জীবনে অভিযোজনের লক্ষ্যে দৈহিক গঠনে উৎকর্ষ লাভ করছিলো, তখন একই সময়ে উদ্ভিদজগতেও পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছিলো। আদিকালের শৈবাল ছিলো মূলহীন। মাটির উপরে বা নিচে অনুভূমিকভাবে প্রলম্বিত কাণ্ড থেকে ওদের উদ্ভব ঘটতো এবং লম্বভাবে বা খাড়াভাবে অবস্থান করতো। অনুভূমিক ও খাড়া দেহাংশের বৈশিষ্ট্য ছিলো একই রকম। চারপাশের তৎকালীন আর্দ্র পরিবেশ এই অবস্থার জন্য যথার্থ ছিলো বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই সময়কালে পৃথিবীতে স্থায়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থা কেবল ভূনিম্নস্থ জলকণাপূর্ণ মাটি ও ফল্গুধারার মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছিলো। মাটির নিচ থেকে জল পেতে হলে উদ্ভিদের মূল থাকা চাই। মূলকে মাটির কণার ভিতরে যেতে হবে এবং কণাসংলগ্ন জল শোষণ করতে হবে। এই সময়ে তিনটি উদ্ভিদগ্রুপের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সকল উদ্ভিদে মূলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে যে সকল উদ্ভিদ পৃথিবী জুড়ে রয়েছে, এদের সবগুলোই উপরিলিখিত তিন গ্রুপের উদ্ভিদের অপরিবর্তিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত উত্তরসূরি।

উত্তরসূরিদের একটি হলো ক্লাব মস (Club moss)। দেখতে মস বা শৈবালেরই মতো। অবশ্য ক্লাব মসের কাণ্ড, শৈবালের কাণ্ড থেকে দৃঢ়, মজবুত ও শক্ত। দ্বিতীয় উত্তরসূরি হলো হর্সটেইল (Horsetail)। স্যাঁতসেঁতে মাটি ও খানাখন্দে এরা জন্মায়। এদের কাণ্ডের কোথাও কোথাও সুইয়ের মতো সরু পাতা থাকে। পাতা কাণ্ডের চারপাশ ঘিরে বলয়াকৃতিতে অবস্থিত। তৃতীয় উত্তরসূরির নাম ফার্ন (Fern)। তিন উত্তরসূরি উদ্ভিদের কাণ্ডে মজবুত নালি রয়েছে। মূলের দ্বারা শোষিত জল নালির সাহায্যে কাণ্ডে পরিচালিত হয়। দৃঢ় ও শক্ত কাণ্ড ওদের খাড়া রাখে। ফলে এরা ক্রমে উঁচু হতে থাকে। এ কারণে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতা অধিকতরো সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্যে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলেও একে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু কেনো এই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম!

সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদ সূর্যরশ্মির আনুকূল্য লাভের জন্যে সচেষ্ট থাকে। সৌররশ্মি উদ্ভিদের জৈবনিক কর্মকাণ্ডে বড়ো ভূমিকা পালন করে। সেই ভূমিকাটি হলো উদ্ভিদের দেহে খাদ্য তৈরি করা। সৌররশ্মি সবুজ পত্রস্থিত বা কাণ্ডস্থিত ক্লোরোফিলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে দেহবস্তুতে সংশ্লেষণ ঘটায়। এ জন্যে উদ্ভিদের জীবনে উচ্চতা লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো উদ্ভিদ অন্যান্য উদ্ভিদের ছায়ায় নিচুতে পড়ে থাকে তাহলে পর্যাপ্ত সূর্যরশ্মি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। বড়ো উদ্ভিদের ঘন পাতা ছাওয়া চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে যেটুকু সূর্যকিরণ লভ্য হয়, তা অনেক সময় নিচুতে থাকা উদ্ভিদের জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে উদ্ভিদটি ক্রমে দুর্বল হয়ে মারা পড়ে। আদি গ্রুপের উদ্ভিদরাজি কাণ্ডে দৃঢ়তা অর্জনে সক্ষম হওয়াতে খুব উঁচুতে উঠতে পেরেছিলো। উচ্চতায় ত্রিশ মিটার বা তারও বেশি। বেড় দুই মিটার। আকার ও আকৃতি বিচারে এই সকল উদ্ভিদকে বলা হয় বৃক্ষ। ক্লাব মস ও হর্সটেইল জাতীয় উদ্ভিদ এখনো স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মায়।

এই নিবিড় অরণ্যের কাণ্ড ও পাতার অবশেষ থেকেই কয়লার উৎপত্তি। পৃথিবীর প্রথম অরণ্যের উদ্ভিদসমূহের কাণ্ডের বেড় দেখে বোঝা যায়, এরা দীর্ঘজীবী ছিলো। কয়লার পরিমাণ

প্রমাণ করে যে এরা সংখ্যায় ছিলো প্রচুর। স্থলভাগের অভ্যন্তরেও ফার্নের সঙ্গে মিলেমিশে এই গ্রুপসমূহের অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। উদ্ভিদসমূহে সত্যিকারের পাতা গজিয়েছিলো। ফলে পর্যাপ্ত সৌরকিরণ গ্রহণ করে উদ্ভিদকে বিরাট আকারদানে মদদ জোগাতে পেরেছিলো। বর্তমানের উষ্ণমণ্ডলীয় বৃষ্টিবিধৌত অরণ্যে এখনো টিকে থাকা ফার্ন বৃক্ষের কাণ্ডের অনুরূপ অতীতের সেসব উদ্ভিদের কাণ্ড বাঁকানো ছিলো।

পূর্বেই আলোচিত যে, আদি উদ্ভিদকুল পূর্বসূরি শৈবালের মতো দুটো জনুক্রমে প্রজনন ঘটাতো—যৌন প্রজনন ও অযৌন প্রজনন। উদ্ভিদের উচ্চতা স্পোর বিতরণে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতো না। স্পোর উদ্ভিদের শীর্ষে থাকতো। বাতাস সহজেই স্পোর বয়ে নিয়ে দূরে ছড়াতো। যৌনকোষ বিতরণের বিষয়টি ছিলো ভিন্ন। এই সময় পর্যন্ত, পুরুষ জননকোষ জলে সাঁতার কেটে এসে নিষেক ঘটানোর মাধ্যমে যৌন প্রজনন সম্পন্ন হতো। এই প্রক্রিয়ায় চাহিদা অনুসারে যৌন প্রজননের কাল হতো স্বল্প এবং যৌন জনন ঘটতো ভূমিতে। ফার্ন, ক্লাব মস ও হর্সটেইলে এখনো একইভাবে যৌন প্রজনন সংঘটিত হচ্ছে। এ সকল উদ্ভিদের স্পোর ফিল্মের মতো পাতলা এক প্রকার উদ্ভিদে পরিণত হয়। উদ্ভিদের এ ধরনের পরিণতির ফলে সৃষ্ট অঙ্গকে বলা হয় থ্যালাস (Thallus)। দেখতে অনেকটা লিভার উর্টের মতো। থ্যালাসের অঙ্কভাগ সবসময় আর্দ্র থাকে। থ্যালাস অঙ্কভাগ থেকেই যৌনকোষ বিমুক্ত করে। স্ত্রী জননকোষ পুরুষ জননকোষ দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্ব দীর্ঘদেহী উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই উদ্ভিদ আবার স্পোর সৃষ্টি করে। এভাবে জনুক্রম বা যৌন প্রজনন অযৌন প্রজনন চক্রবৎ চলতে থাকে।

মাটিতে পড়ে থাকা থ্যালাস অনেকসময় বিপদাপন্ন হতো। প্রাণীরা একে অনায়াসে উদরপূর্তি করতে পারতো। পানি শুকিয়ে গেলে থ্যালাসের মৃত্যুও ঘটতে পারতো। অতি সফল অযৌন প্রজননসৃষ্ট উদ্ভিদের ধনুকের মতো বাঁকানো পাতাসমূহ সূর্যালোককে বনভূমিতে পড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। এতে থ্যালাসের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো বেশি। থ্যালাস দীর্ঘরূপ ধারণ করতে পারলে এ সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারতো। অবশ্য থ্যালাস লম্বা হলে পুরুষ জননকোষকে স্ত্রী জননকোষের সান্নিধ্যে আসার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করতে হতো।

এসব সমস্যার সুরাহার জন্য দুটি কার্যকর পদ্ধতি ছিলো। এর একটি প্রাচীন বা আদি পদ্ধতি। বাতাস যেভাবে স্পোর বয়ে নিয়ে বিতরণ করে থ্যালাসের ক্ষেত্রেও তাই করা বাতাসের পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু এতে পুরুষ জননকোষের ভাগ্য হতো অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক। দ্বিতীয় তুলনামূলকভাবে নবীন পদ্ধতি হলো, পতঙ্গের মাধ্যমে যৌনকোষ বহন করানো। এই সার্ভিস দেওয়ার মতো পতঙ্গকুলের তখন আবির্ভাব ঘটেছিলো। পতঙ্গরা তখন সেই আদি অরণ্যে নিয়মিতভাবে উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে ঘুরে বেড়াতো এবং উদ্ভিদের পাতা ও স্পোর আহার করতো। উদ্ভিদ আদি ও নবীন দুই পদ্ধতিরই সুযোগ গ্রহণ করে। সাড়ে তিন শ কোটি বছর আগে কতিপয় উদ্ভিদের উদ্ভব হয় যেগুলোর যৌন জনুক্রমে অংশগ্রহণকারী উদ্ভিদ থ্যালাসের মতো মাটি সংলগ্ন ছিলো না। এগুলো গাছের উপরে পাতার ভিড়ের মধ্যে

যৌন প্রজননের কাজ সম্পাদন করতো। এ সকল উদ্ভিদের মধ্যে একটি গ্রুপের উদ্ভিদেরা আজো টিকে আছে। একটি নির্দিষ্ট নাটকীয় পর্যায়ে এঁদের যৌন জনুক্রমের বিকাশ ঘটে। এই উদ্ভিদ গ্রুপের নাম সাইকাড (Cycades)।

খুব একটু খুঁটিয়ে না দেখলে সাইক্যাডকে ফার্নের মতো দেখায়। সাইক্যাডের পাতা লম্বা ও মোটা। অনেকটা পাখির পালকের মতো। কতিপয় সাইক্যাডে আদি পদ্ধতিতে ছোট স্পোর সৃষ্টি হয়। বাতাস এ সকল স্পোর ছড়ায়। অন্য কতকগুলো সাইক্যাড বড় স্পোর তৈরি করে। এই স্পোরকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। স্পোর উদ্ভিদ–সংলগ্ন থাকে। সংলগ্ন থাকাকালে স্পোর থ্যালাসের মতো এক ধরনের মোচাকৃতির অঙ্গ সৃষ্টি করে। মোচার মধ্যেই ডিম্বের জন্ম হয়। তখন বায়ু বাহিত স্পোর ডিম্বধারী মোচায় নেমে আসে এবং অংকুরিত হয়। অংকুরিত স্পোর আর পাতলা ফিল্মের মতো থ্যালাসের রূপ নেয় না। কারণ এখন আর এরকমটি হবার প্রয়োজন নেই। স্পোর একটা নলের আকৃতি পায়। নল মোচা খনন করতে করতে নিচে নামে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক মাস লাগে। নল গঠন সম্পূর্ণ হলে অবশিষ্ট স্পোর থেকে শুক্রাণু কোষের সৃষ্টি হয়। সিলিয়াযুক্ত বর্তুলাকৃতির শুক্রাণুটি দেখতে অপূর্ব সুন্দর। উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের মধ্যে এই শুক্রাণুই আকারে সর্ববৃহৎ। একে খালি চোখে দেখা যায়। শুক্রাণু ধীরে নালিপথ বেয়ে নিচে নামে। মোচার তলায় নামার পর শুক্রাণু এক ফোঁটা জলে প্রবেশ করে। মোচার ভিতরের চারপাশের কলা এই জলবিন্দু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু জলবিন্দুতে সিলিয়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করে। সাইক্যাডের পূর্বসূরি অ্যালগী বা শৈবাল উদ্ভিদের শুক্রাণু যেভাবে আদি সমুদ্রে অভিযান করতো, সাইক্যাডের শুক্রাণুও অনুরূপ দৃশ্যের মহড়া প্রদর্শন করে। যদিও এই প্রদর্শনী চলে সীমাবদ্ধ জলে। মাত্র কয়েকদিন পর শুক্রাণু ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয় এবং নিষেক সম্পন্ন হয়। এভাবে সাইক্যাডে দীর্ঘ নিষেক কর্মকাণ্ডের যবনিকাপাত হয়।

সাইক্যাডের সমসাময়িককালে উদ্ভূত অন্য একটি গ্রুপের উদ্ভিদরাও সাইক্যাডের অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে। এই গ্রুপের নাম কনিফারস (Conifers), পাইনস (Pines), লার্চেস (Larches), সিডারস (Sedars), ফারস (Furs) এবং এদের স্বগোত্রের উদ্ভিদসমূহ কনিফার গ্রুপের সদস্য। এরাও তাদের স্পোর বিতরণের ক্ষেত্রে বাতাসের উপর নির্ভরশীল। তবে এরা একই উদ্ভিদে স্ত্রী ও পুরুষ মোচা ধারণ করে যা সাইক্যাডে দেখা যায় না। পাইনে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় আরো বেশি লাগে। মোচার নল তৈরি হতে এবং শুক্রাণুর নিচে নামতে পুরো এক বছর সময় লাগে। তবে এদের ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট নালি সরাসরি ডিম্বের সংস্পর্শে আসে এবং শুক্রাণু নালি বেয়ে নিচে নেমে জলকেলি না করে সরাসরি ডিম্বকে নিষেক করে। লক্ষণীয় যে কনিফারই প্রথম যৌন–জনন প্রক্রিয়ায় জলকে পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের পাঠ চুকিয়ে দেয়।

এদের মধ্যে আরো একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিষিক্ত ডিম্ব মোচার মধ্যে এক বছরের অধিক সময় ধরে অবস্থান করে। নিষিক্ত ডিম্বের কোষে কোষে সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং ডিম্বের চারপাশে জলরোধী আবরণের সৃষ্টি হয়। অবশেষে নিষেক সম্পন্ন

হওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর দুবছরেরও সময় পরে মোচা শুকিয়ে কাঠে পরিণত হয়। মোচার খণ্ডসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলে গিয়ে নিষিক্ত ডিম্বের অবমুক্তি ঘটায়। বীজে জল প্রবেশ না করা পর্যন্ত এটি বছরের পর বছর অংকুরিত হবার অপেক্ষায় থাকতে পারে। পানি বীজকে উজ্জীবিত করে এবং একে অংকুরিত করে। এভাবে বীজের জীবনে নববসন্তের সূচনা হয়।

যে কোনো মূল্য বিচারে উদ্ভিদকুলের মধ্যে কনিফারই বড়ো ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে। পৃথিবীর প্রায় এক–তৃতীয়াংশ অরণ্য কনিফারদেরই সৃষ্টি। যে কোনো ধরনের জীবিত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে কনিফারের সদস্য উদ্ভিদসমূহই আকারে সবার চেয়ে বড়ো। ক্যালিফোর্নিয়ার জায়ান্ট রেড উড (Giant red wood) বা দানো লাল বৃক্ষ উচ্চতায় একশ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্রিসল কোন পাইন (Bristle cone pine), অপর একটি কনিফার জাতীয় বৃক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ–পশ্চিমের শুষ্ক পর্বতে ওরা এখনো জন্মায়। এদের পরমায়ু সকল জীবের চেয়ে বেশি। ব্রিসল কোন পাইনের গুঁড়ির গাঁট ও বাঁক থেকে বর্ষবলয় গুণে দেখা গেছে যে, এগুলোর বয়স পাঁচ হাজারেরও বেশি। এরা মানবসভ্যতার পুরো বিকাশকালেই নানান অবদান জুগিয়ে যাচ্ছে।

পতঙ্গদের ওড়ার ক্ষমতাকে বৃক্ষেরা তাদের অনুকূলে কাজে লাগায়। বৃক্ষ এতোদিন জননকোষ বিতরণে কেবল বাতাসের উপর নির্ভরশীল ছিলো। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। স্পোরের নিষিক্ত হবার প্রয়োজন পড়ে না। স্পোর যে মাটিতে পড়ে সেখানেই গজায়। তবে মাটি হওয়া চাই ভেজা ও উর্বর। অধিকাংশ স্পোরের ক্ষেত্রে এই শর্তদ্বয় পূরণ না হবার দরুন এরা গজাতে পারতো না। একইভাবে বায়ুবাহিত পরাগ রেণুরও কার্যকরী ভূমিকা পালনে বাধা আসতো। যদি পরাগ রেণু স্ত্রী মোচায় পড়তো তাহলেই কেবল নিষেক ক্রিয়ায় সাহায্য করতে পারতো। এ কারণে পাইন বৃক্ষকে বিপুল পরিমাণ রেণু উৎপাদন করতে হয়। একটি পুরুষ মোচা কয়েক কোটি রেণু উৎপাদন করে। যদি বসন্তে একটি মোচার রেণু সংগ্রহ করা হয় তাহলে দেখা যাবে সব রেণু মিলে সোনালি মেঘের সৃষ্টি করেছে। পুরো একটি পাইন অরণ্য বিশাল এক জলাশয়কে ভরাট করে ফেলে। পতঙ্গ পরাগ বহনে ভূমিকা না নিলে সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এমনতরো অপচয় সংঘটিত হতো।

পতঙ্গরা দক্ষ পরিবহণ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলো। এদেরকে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারলে বৃক্ষের সুবিধা হয়। ওরা অল্প পরাগ বহন করে ফুলে ফুলে নিষেক সম্পন্ন করাতে পারে। একই বৃক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল থাকলে আরো সুবিধের। কিন্তু পতঙ্গরা বৃক্ষকে বিনা লাভে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে এই কাজ করে দেবেই বা কেনো? পতঙ্গদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যেই বৃক্ষ ফুলের বিকাশ ঘটাতে শুরু করে। সপুষ্পক উদ্ভিদের উদ্ভবের মূল কারণ ছিলো মূলত এটিই।

ফুলের আবির্ভাবে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। শ্যামলী নিসর্গ এখন রঙের সমাবেশে উজ্জ্বল। বৃক্ষেরা পতঙ্গ ও পাখিদের পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে আনন্দের এই বিজ্ঞাপন প্রদর্শন

করে। সঙ্গে উপহার দেয় পরাগ। যা আগন্তুকদের খাদ্য। এ ছাড়াও নানান উৎকোচের ব্যবস্থা করে বৃক্ষ। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো মকরন্দ বা মধু। ফুলের সুঘ্রাণও ওদের জন্য আকর্ষণীয়। আবার কোনো কোনো ফুল এমন কোনো পতঙ্গের রঙের অনুরূপ রঙ ধারণ করে যাতে পতঙ্গটি অনায়াসে বর্ণচোর বৃত্তি গ্রহণ করে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে পারে। পতঙ্গরা ফুলে ফুলে বিচরণ ও মধুপান করাকালে ওদেরই অগোচরে পায়ে পাখায় শুঙ্গে পরাগ লেগে যায়। পতঙ্গরা অন্য ফুলে গেলে পরাগ রেণু অন্য ফুলের গর্ভকেশরের সংস্পর্শে আসে। এভাবে ফুলে গর্ভসঞ্চার হয়। এতে করে ফল, বীজ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। বীজের মাধ্যমে বৃক্ষ নব প্রজন্মের সৃষ্টি করে।

বৃক্ষের এই ফুল, ফুলের বিচিত্র বর্ণ, ফুলের নানান ধরনের সুগন্ধি, ফুলের বহুরকম আকার ও আকৃতি, মধু ইত্যাদির কাছে মানবসভ্যতা ঋণী। এ সকল ফুলের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষের উদ্ভবের আগে। আবার এই ফুলই আদি অরণ্য সৃষ্টিতে ও অরণ্য–বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ সবল ভূমিকা রেখেছিলো। আজো ফুল একই ভূমিকা পালন করছে।

১.৪ বৃক্ষের মূল্য

বৃক্ষের মূল্য অপরিসীম। খুব সহজেই এর হিসাব করা যায়। আবার যথাযথভাবে তা করাও যায় না। কারণ বৃক্ষের মূল্য নির্ধারণের জন্য যেসব বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়, তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশে চেষ্টা করেছেন।

এরই মাঝে ভারতের বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. তারকমোহন দাস পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি বৃক্ষ, যার আনুমানিক ওজন পঞ্চাশ টন, তার মূল্য নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত পরিবেশকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বৃক্ষের মূল্য নির্ধারণ করেছেন নিম্নলিখিতভাবে—

১.	বৃক্ষটি যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করে তার মূল্য	৭,৫০,০০০.০০
২.	জীবজন্তুর জন্য যে আমিষ দেয় তার মূল্য	৬০,০০০.০০
৩.	মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আত্মত্যাগের মূল্য	৭,৫০,০০০.০০
৪.	জলের আবর্তন চক্রের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের মূল্য	৯,০০,০০০.০০
৫.	আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণের মূল্য	১৫,০০,০০০.০০
৬.	পাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু ও ছোটখাট উদ্ভিদের আশ্রয় হিসেবে মূল্য	৭,৫০,০০০.০০
	সর্বমোট	৪৭,১০,০০০.০০

(মোট সাতচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)

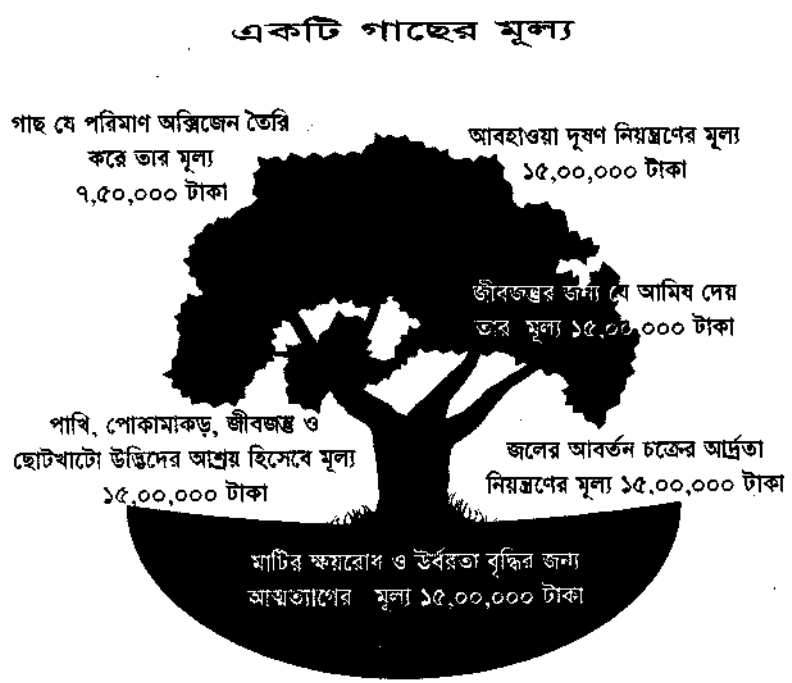

চিত্র ১ : গাছের মূল্য

বৃক্ষের বয়সও পারিবেশ ও অন্যান্য কারণের উপর ভিত্তি করে কম বেশি হতে পারে। সারণি ২-এ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরমায়ুবিশিষ্ট বৃক্ষের নাম ও বয়স দেখানো হয়েছে।

সারণি ২ ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরমায়ুবিশিষ্ট বৃক্ষ

গাছের নাম	কোথায় অবস্থিত	বয়স
রেড উড	ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র	৪০০০ বছরের অধিক
সিকোয়া *(Saquoia gigantea)*	ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র	৩২৩০
উই (Yew)	যুক্তরাজ্য	৩০০০
দেওদার	তেহরি গেরওয়াল,উত্তরপ্রদেশ,ভারত	৭০৪
সেগুন	উলান্ডি, তামিলনাড়ু, ভারত	৫০০ বছরের অধিক
শিশাম	উল্যান্ডি, তামিলনাড়ু, ভারত	৬০০ প্রায়
চির	ছক্রতা, উত্তরপ্রদেশ	৩২৭
চিনার	শ্রীনগর, ভারত	২৯৩

১.৫ বন ও মানুষের সম্পর্ক

মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে বলে জানা যায়। বৃক্ষ, তরুলতার জন্ম তারও অনেক অনেক আগে। এক সময় আদি মানুষ গভীর বনে, গাছের ছায়ায় বা কোটরে বাস করতো। গাছের পাতা, ফল, মূলই ছিলো মানুষের প্রধান আহার্য। দেহের আচ্ছাদন ছিলো গাছের পাতা, ডাল ও বাকল। ক্রমে মানুষ গাছের বীজ বুনে ফসল ফলানো শেখে। শেখে গাছপালা দিয়ে ঘরবাড়ি বানানোর কৌশল। সে সঙ্গে আয়ত্ত করে রান্নাবান্নার কৌশলও। ঘরবাড়ি বানানোর জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত, লতা এবং রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি মানুষ সংগ্রহ করতো বন থেকেই। এখনো মানুষ ঘরদোর-আসবাবপত্র বানানোর জন্য অনেকাংশে বনের উপর নির্ভরশীল। যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস বা কেরোসিনের সরবরাহ নেই সেখানে মানুষ জ্বালানির জন্য পুরোপুরি বনের কাঠ-বাঁশের উপর নির্ভরশীল। বনের কাঠ, বাঁশ ও লতাপাতা তাদের জ্বালানির প্রধান উৎস।

এসব কারণে মানুষ আদিকালে বন ও গাছের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য কাল্পনিক বনদেবী ও নানান গাছের পূজা করতো। পরবর্তীকালে মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষায় গাছের ভেষজ গুণও আবিষ্কার করে। এখনো কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ বট, অশ্বত্থ, বেল জাতীয় বৃক্ষ ও তুলসী ও দুর্বা জাতীয় গুল্মকে পূজা করে বা পূজার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনো দক্ষিণ রায় ও বনবিবির পূজা প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায় হলেন বাঘের দেবতা। কারো কারো মতে দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের একজন শিকারি ছিলেন। তিনি তীর ধনুকের সাহায্যে অনেক বাঘ ও কুমির শিকার করেছিলেন। অপর মতে, দক্ষিণ রায় ছিলেন যশোহরের ব্রহ্মানগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। দক্ষিণ রায়ের পূজার স্থান সাধারণত কোনো বট, পিপুল বা নিম গাছের তলায়। বিগ্রহ হলো মাটির ঢিবি বা সিঁদুর মাখানো প্রস্তরখণ্ড বা বিচিত্র এক মুণ্ড। সুন্দরবনের খাল ও নদীর ধারে দক্ষিণ রায়ের থান দেখা যায়। মৌলী, পোদ, বাগদী, বুনো কাঠুরে ও মাঝি সম্প্রদায় এই দেবতার পূজা করে। দক্ষিণ রায়ের গল্প নিয়ে মধ্য-যুগের কয়েকজন কবি 'রায় মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যে দক্ষিণ রায়ের পূজা কিভাবে প্রবর্তিত হলো তার সবিস্তার বর্ণনা আছে। কোথাও কোথাও দক্ষিণ রায়ের সাথে বড় গাজী খাঁর মাজার ও দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড একই সঙ্গে পূজিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই গাজী সাহেব ও তাঁর ভাই কালুকে স্মরণ করে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

রায়মঙ্গলের অনুরূপ বনবিবি-জহুর কাব্যে হিন্দুদের দক্ষিণ রায় কল্পনা ও মুসলিমদের বনবিবির কল্পনার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ভক্তদের সাথে বনবিবির প্রীতি-ভালোবাসা ও অভয়দাত্রীর সম্পর্ক। তাই, মৃৎশিল্পীরা এঁকে সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী রূপেই কল্পনা করেছেন। অবশ্য মূর্তির রূপভেদও খুবই কৌতূহল উদ্দীপক। কোথাও মূর্তি মোগল রমণীদের মতো- মাথায় জরির টুপি, বিলুনী করা চুল, অঙ্গে ঘাঘরা-সেলোয়ার। এক হাতে শিশু অন্য হাতে ফুল। দেবীর আসন বাঘ বা মুরগির উপর। কোনো কোনো বন বিবির মূর্তিতে হিন্দু রমণীর

পোশাক পড়া। অবশ্য বাঙালি হিন্দু রমণী। বনবিবি-জহুর কাব্যে এই দেবী পূজার কাহিনী বিধৃত আছে।

শুধু এখানে নয় পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বন ও বৃক্ষকে ঘিরে নানান কাল্পনিক গল্প, গাঁথা, পূজা অর্চনা প্রচলিত আছে এখনো। মানুষ নিজের উৎস সন্ধানের জন্য বা আত্মানুসন্ধানের জন্য এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট সান্নিধ্য লাভের প্রেরণায় বনজঙ্গলকেই বেছে নিতো। আজো নিয়ে থাকে। বিশেষ করে নিভৃতচারী, আত্মমগ্ন, ঈশ্বর অনুসন্ধানী মানুষেরা। গহন জঙ্গলে ফকির সন্ন্যাসীদের এখনো ডেরা পাততে দেখা যায়। রামায়ন, মহাভারত মহাকাব্যের প্রেক্ষাপট মূলত বনাঞ্চলকে ঘিরেই আবর্তিত। ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যানসমূহেও বনাঞ্চল বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বনাঞ্চলের রহস্যময়তা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গল্প, উপন্যাস, কাব্য। আধুনিককালের চলচিত্রেও কোনো না কোনোভাবে বনজঙ্গল ও পর্বত এসেই যায়। তেমনি গল্প-উপন্যাসেও। দিনে দিনে মানুষ পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে বনজঙ্গল মানবজাতিকে কেবল বনজসম্পদই সরবরাহ করছে না, বন ও বৃক্ষ মানুষকে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বনাঞ্চল মাটি সংরক্ষণ করে। মাটির ক্ষয়রোধ করে, বন্যা ঠেকায়। বনাঞ্চলের আর্দ্র বাষ্প মেঘ তৈরিতে সহায়তা করে ও বৃষ্টিপাত ঘটায়। সারা বছর নদীর জলপ্রবাহকে ঠিকমতো বজায় রেখে কৃষিকে সাহায্য করে। বনাঞ্চল পৃথিবীকে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো এই বনাঞ্চল। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনাঞ্চলের কোনো বিকল্প নেই। বনাঞ্চল মানুষের বিনোদনেরও একটি বড়ো উপকরণ। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানবজাতি নয় শুধু সমগ্র প্রাণিজগৎ নানাভাবে বনের উপর নির্ভরশীল ছিলো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মানুষ ও বন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন ছিন্ন হলে মানুষের বিপদ ক্রমেই বাড়বে। সে সঙ্গে পৃথিবীর জন্যও তা হবে অশনি-সংকেত।

১.৬ পৃথিবীর বনবনানী

পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ১৩৩৯০ মিলিয়ন হেক্টর। এর ৪০৭৭ মিলিয়ন হেক্টরে অর্থাৎ সর্বমোট ভূমির ৩০.৪ শতাংশে বনভূমি রয়েছে। সমগ্র বনভূমির শতকরা ১৮ ভাগ উত্তর আমেরিকা ও কানাডা, ২২ ভাগ দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো ও অন্যান্য দেশে ৪ ভাগ, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯ ভাগ এবং এশিয়ার দেশগুলোত রয়েছে ৩৭ শতাংশ বনভূমি। পৃথিবীর বনাঞ্চলকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. বেরিয়েল কনিফার বা মোচাকৃতিজাতীয় গাছের বন ;

২. নাতিশীতোষ্ণ দারুময় কাঠের বন ; এবং

৩. ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বন।

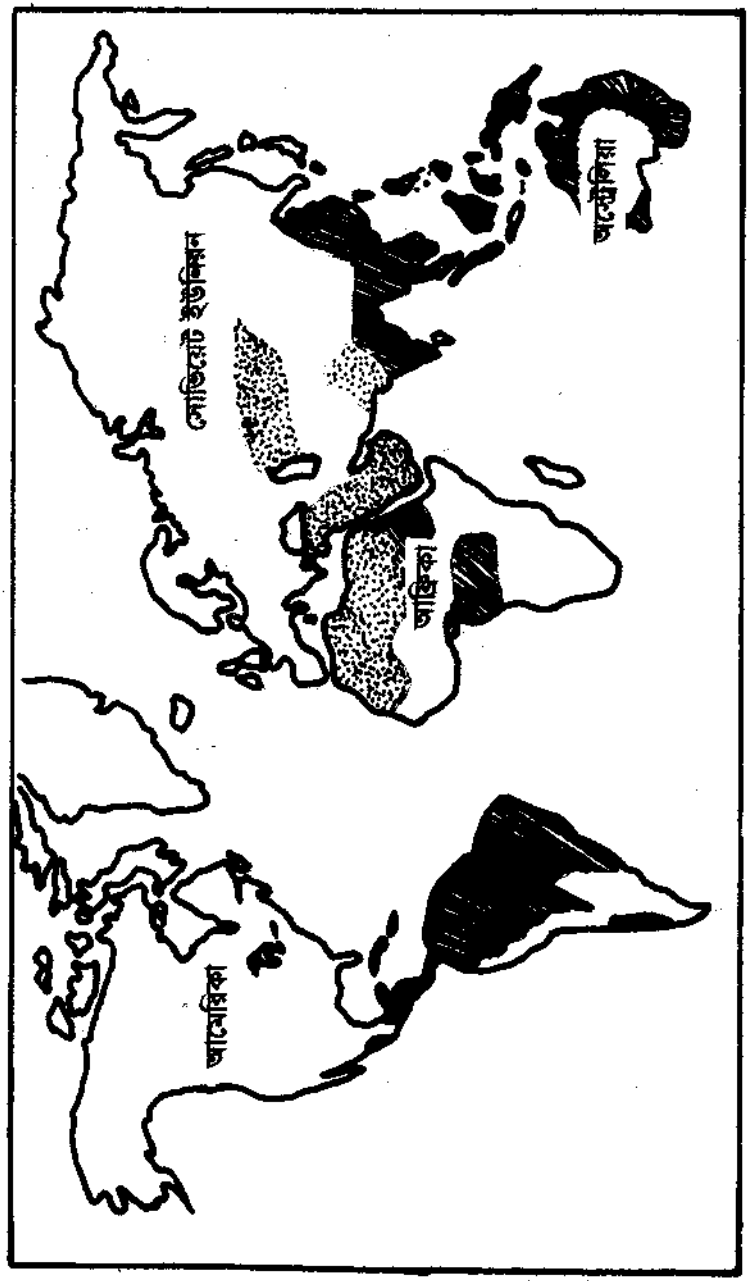

চিত্র ২ : পৃথিবীর বন ও বনাঞ্চলের বিস্তার

১.৬.১ বেরিয়েল কনিফার বা মোচাকৃতিজাতীয় গাছের বন

বেরিয়েল শীতল আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা গাছের বন। এখানে মোচাকৃতির গাছ যেমন স্প্রুস, ফার গাছই প্রধানত জন্মায়। এ ছাড়া পাইন, লার্চ ও হেমলকজাতীয় গাছও এখানে জন্মাতে পারে। তুন্দ্রা অঞ্চলের নিচ থেকেই এই বনের বিস্তৃতি।

উষর বন

পাহাড়ী বন

মরু বন

চিত্র ৩ক, ৩খ ও ৩গ : বিভিন্ন ধরনের বন ও বনাঞ্চল

১.৬.২ নাতিশীতোষ্ণ দারুময় কাঠের বন

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় দারুময় কাঠের বনে সাধারণত পাতাঝরা বৃক্ষেরই প্রাধান্য। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়াতে এই ধরনের বন অবস্থিত। এখানে বার্চ, বিট, মেপল, এ্যাস, ওক, এলম ও বাস গাছই বেশি দেখা যায়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সারা বছর প্রায় একই।

১.৬.৩ ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বন

সবচেয়ে সমৃদ্ধ বনাঞ্চল হলো ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল। প্রচুর বৃষ্টিপাত, সারা বছর গরম স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া এবং নদীর পাড়ের নিচু অঞ্চলে এই বন গড়ে উঠে। দক্ষিণ আমেরিকা, ক্রান্তীয় আফ্রিকা, ভারত, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে এ জাতীয় বনের বিস্তৃতি অনেক বেশি। কিছুদিন আগেও এই ধরনের বনাঞ্চল ছিলো পৃথিবীর সমগ্র বনাঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি। এখান থেকে প্রতি বছর প্রায় ১২ মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে বিলুপ্ত হচ্ছে ৪০ হেক্টর বনাঞ্চল। ফলে বোঝাই যাচ্ছে চিরহরিৎ এই শ্যামলী নিসর্গ ক্রমে ধ্বংসের পথে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে প্রায় ৭৭ হেক্টর বনভূমি নানা কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রধান কারণ অবশ্য মানুষের অবিবেকী কর্মকাণ্ড ও অবিমৃষ্যকারিতা। বইয়ের শুরুতে বিজ্ঞানী আলডুস হাক্সলীর বাণীটি এ প্রসঙ্গের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কতিপয় দেশের প্রকৃত বনাঞ্চলের হিসাব সারণি ১-এ দেখানো হলো।

সারণি ১ঃ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কতিপয় দেশের প্রকৃত বনাঞ্চলের হিসাব

দেশ	ভৌগোলিক আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	বনাঞ্চলের আয়তন (মিলিয়ন হেক্টর)	বনাঞ্চলের শতকরা (%) হার
অস্ট্রেলিয়া	৭৬২	১০৭	১৪.০৪
কানাডা	৯২২	৩২৫	৩৪.৪০
রাশিয়া	২২৪০	৯২০	৪১.০৭
জার্মানি	৩৬	০১০	৩৬.০০
ইটালি	২৯	০০৬	২০.৬৯
জাপান	৩৭	০২৫	৬৭.৬০
নেপাল	১৪	০০৪	২৮.৬০
সুইডেন	৪৫	০২৬	৫৭.৪০
সুইজারল্যাণ্ড	০৪	০০১	২৫.০০
যুক্তরাজ্য	২৪	০০২	০৮.৩০
যুক্তরাষ্ট্র	৯৩৬	২৯০	৪১.০৭
ভারত	৩২৯	০৬৪	১৯.৪০
বাংলাদেশ	১৪.৪৪	২.৫৬	১৮.০৫
পৃথিবী	১৩৩৯০	৪০৭৭	৩০.৪০

উৎস : FAO ১৯৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের বনবনানী

...কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিক যতদূর দৃষ্টি চলে। অরণ্যের অস্পষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে...। এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা!...মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এতো সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২.১. বনের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল মূলত ক্রান্তীয় বনেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও ফলবান অঞ্চল। এখানে সূর্যের খর তাপ পড়ে। প্রায় সারা বছর ধরে গরম আবহাওয়া বিরাজমান থাকে। নির্দিষ্ট একটা সময়ে অঝোরে বৃষ্টিপাত হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের হার, বছরব্যাপী বৃষ্টিপাতের বিতরণ ও পানির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে এই ক্রান্তীয় বনরাজ্যকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগসমূহ নিম্নরূপ :

১. ম্যানগ্রোভ বা গরানজাতীয় বনঞ্চল ;
২. খোলা বন (সাভানা, গুল্মজাতীয় ও সংরক্ষিত বনসম্পদ) ;
৩. মৌসুমী বনাঞ্চল ;
৪. ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চল ; এবং
৫. গ্রামীণ বন ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল।

২.১.১ ম্যানগ্রোভ বা গরানজাতীয় বনঞ্চল : ক্রান্তীয় এলাকার উপকূলীয় অঞ্চলে যে সকল জায়গা সারা বছর নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে সেখানে এই বন সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চল দিনে দুবার জোয়ার-ভাটার পানিতে বিধৌত হয়। নদীর বদ্বীপ অঞ্চলেও এই বন দেখা যায়। খুলনার সুন্দরবন, চকোরিয়ার সুন্দরবন ও টেকনাফের উপকূলীয় বন ম্যানগ্রোভ বা গরান বন হিসেবে চিহ্নিত।

২.১.২ খোলা বন : কম বৃষ্টি ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এই ধরনের বন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ খোলা বনের সৃষ্টি হয়। নির্বিচারে বন কাটার ফলেও রূপান্তরিত এই বনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃক্ষ নিধনের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহে এই ধরনের খোলা বনের সৃষ্টি হয়েছে।

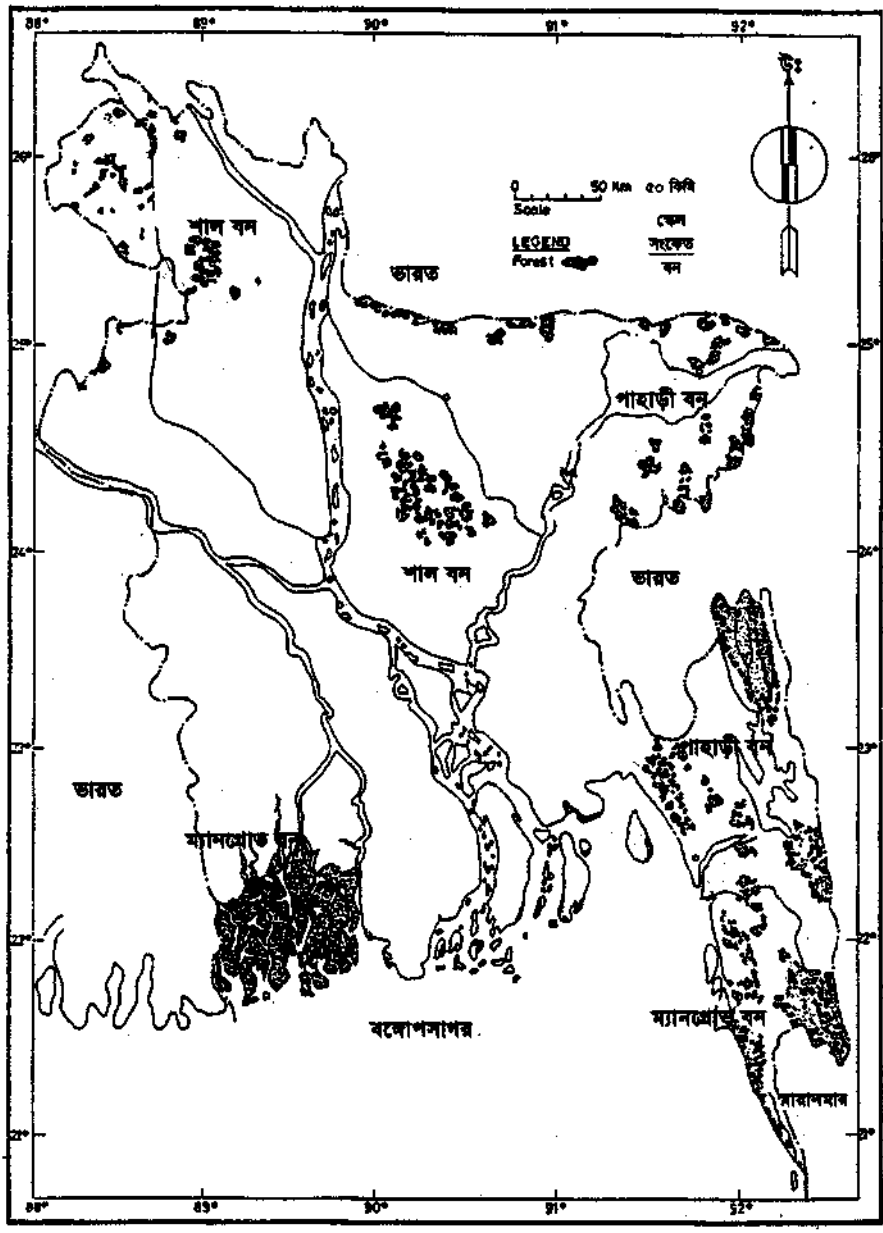

চিত্র ৪ : বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল

২.১.৩ মৌসুমী বনাঞ্চল : মৌসুমী বনাঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে বছরে এক বা একাধিক ঋতুতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এই বনে পত্রঝরা বৃক্ষ থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বনাঞ্চলই এর অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রাম, সিলেট, মধুপুর গারো পাহাড়ের বনাঞ্চল মৌসুমী বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

২.১.৪ ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চল : ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চলে প্রায় সারা বছর ধরেই বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বন খুব ঘন হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের বনাঞ্চল নেই বললেও চলে।

২.১.৫ গ্রামীণ বন ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল : এ ছাড়া বাংলাদেশে গ্রামীণ বনাঞ্চল ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলও রয়েছে। বনাঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

২.২ অতীত ও বর্তমান বনাঞ্চল

বাংলাদেশের বনবনানী কোনো সময়ে আফ্রিকার বনবনানীর মতো নিবিড় ও ঘন ছিলো না। তবে যে পরিমাণ বনাঞ্চল ছিলো তা পর্যাপ্তই ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার শ্যামলী নিসর্গ মোগল-পাঠান রাজা বাদশাহদের যেমন নজর কেড়েছে, তেমনি এর নয়নাভিরাম বনানী পর্যটকদের করেছে অভিভূত। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বনভূমি হলো সুন্দরবন। এর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা হবে। এক সময় সুন্দরবনের আয়তন ছিলো বিশাল। ১৮৭৪ সালে এ. এম. এম. হোম ও স্যার উইলিয়াম মুিস সুন্দরবনে একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করেন। জরিপে দেখা যায়, সুন্দরবনের বিস্তৃতি ছিলো পটুয়াখালি, বরিশাল, নোয়াখালি, ফরিদপুর, এমনকি ঢাকা পর্যন্ত। কৃষিজমি সম্প্রসারণের ফলে এই বনভূমি ক্রমে সংকুচিত হতে হতে বর্তমানে তা খুলনায় এসে ঠেকেছে। এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিলো সুন্দরবনকে বৃটিশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসা এবং এই অঞ্চল থেকে খাজনা সংগ্রহ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন এলাকা সরকারি মলিকানাধীনে আসে ১৮৭১ সালে। ১৯১৪ সালে আসে সিলেটের বনাঞ্চল। বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার বনাঞ্চলের মালিক ছিলেন স্থানীয় জমিদারগণ। জমিদারদের অনুরোধেই সাটিয়া বনাঞ্চলের দায়িত্ব নেন বৃটিশ সরকার। ভাওয়ালের বন সরকারের অধীনে আসে ১৯১৪ সালে। বনায়ন কর্মসূচির শুরু উনিশ শতকে। সেগুন গাছ রোপণের মাধ্যমে বনায়ন কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন হয়। বনায়নের শুরু চট্টগ্রামেই। সময় ১৮৭১ সাল। উনিশ শতকের শেষে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূমির ২৫ শতাংশের বেশি ছিলো। এই পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত। কিন্তু আজ বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ভূমির ১০ শতাংশের নিচে বনাঞ্চল রয়েছে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশের ১ কোটি ৪৪ লক্ষ হেক্টর জমির ৬৪ ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ৯২ লাখ হেক্টর হলো কৃষিজমি। বন রয়েছে প্রায় ১৮ ভাগ জমিতে। মানে ২৫ লাখ হেক্টর ৬০ হাজার একর জমিতে। এর মধ্যে শ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন ১০ ভাগ (১৫ লাখ হেক্টর), অশ্রেণিভুক্ত বন ৫ ভাগ (সাত লাখ হেক্টর ৩০ হাজার একর), জলভাগ ৬ শতাংশ জমিতে (সাড়ে ৯ লাখ হেক্টর), অন্যান্য ভূমি সাড়ে তিন ভাগ (প্রায় ৫ লাখ হেক্টর)।

পূর্বে বলা হয়েছে ২৫ লাখ হেক্টর ৬০ হাজার একর জমি বনভূমি রয়েছে। অর্থাৎ বনভূমি রয়েছে ১০+৫+৩½ ভাগ জমিতে। জলভাগের হিসাব বনাঞ্চলের মধ্যে তবে বনভূমির মধ্যে নয়। ২৫ লাখ হেক্টর ৬০ হাজার একরের মধ্যে সরকারি বন চা বাগান, রাবার বাগান অন্তর্ভুক্ত। মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেকাংশ অনুৎপাদনশীল অথবা বৃক্ষহীন বিরাণ ভূমি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক বন রয়েছে মোট বনভূমির ৩১ শতাংশ (সাত লাখ ১৩ হাজার হেক্টর), সৃজিত বন ১৩ শতাংশ (৩ লক্ষাধিক হেক্টর), জমি চাষ ও অবৈধ দখলে প্রায় শতকরা ৫ ভাগ (১ লাখ হেক্টর ১১ হাজার একর)।

পার্ক ও অভয়ারণ্য বাদ দিলে বাংলাদেশে সব মিলিয়ে ভালো মানের প্রাকৃতিক বন আট লাখ হেক্টর ৩৫ হাজার একর জমিতে যা দেশের মোট আয়তনের ৫.৮ শতাংশ মাত্র। সংরক্ষিত বন এলাকা ১৬ হাজার হেক্টর যা রাষ্ট্রীয় বন হিসাবে পরিচিত। এই পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১ শতাংশ। বাংলাদেশের বনাঞ্চল, জেলাওয়ারী বনভূমির হিসাব সারণি ৩ ও ৪–এ দেখানো হলো।

সারণি ৩ ঃ বাংলাদেশের বনাঞ্চল

ব্যবস্থাপনা	আয়তন (মিলিয়ন একর)	শতাংশ হিসাবে পুরো দেশের বনভূমি	শতাংশ হিসাবে প্রকৃত বনাচ্ছাদিত ভূমি
বন বিভাগ	৩.৬১	১০.১৫	৫.৮০
জেলা পরিষদসমূহ	১.৬৪	৪.৬	—
ব্যক্তি মালিকানায় (গ্রামীণ বনভূমি)	১.৭৯	৫.০৩	৫.০৩
মোট	৭.০৪	১৯.৭৮	১০.৮৩

উৎস ঃ বনবিভাগ

সারণি ৪ ঃ বনবিভাগের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে জেলাওয়ারী বনভূমির হিসাব (হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সংরক্ষিত বনভূমি	প্রহরাধীন বনভূমি	দখলকৃত বনভূমি	অর্পিত বনভূমি	অশ্রেণিভুক্ত বনভূমি	সর্বমোট বনভূমি
১.	গাজীপুর	২৭৪.৩১	১৭,০২৪.০৩	১৮.৪৫	৮,১৬৫.৩১	--	২৫,৪৮১.৮০
২.	ঢাকা	----	২০৩.৩৮	৮৬.১৩	১২৮.৪৭	--	৮১৭.৯৮
৩.	ময়মনসিংহ	১,৩৪৪.৯২	১,৪৩৮.১১	১২,১৩৫.৫৫	৭৯৫.১৭	--	১৫,৭১৩.৭৫
৪.	টাঙ্গাইল	২২,৪০৩.০১	--	১৭,২৮৬.৩৫	৯,৯৯৭.৪৫	--	৪৯,৬৮৬.৮১

৫.	জামালপুর	—	—	৪,১৯৪.৪১	—	—	৪,১৯৪.৪১
৬.	শেরপুর	—	—	৭,৮৭৯.০৫	—	—	৭,৮৭৯.০৫
৭.	নেত্রকোণা	—	—	৮৪১.৭৬	—	—	৮৪১.৭৬
৮.	সিলেট	৯.০৭৫.৭৭	—	১১,৫৮২.৬৫	—	৩৪৯.০৫	২১,০০৭.৪৭
৯.	হবিগঞ্জ	১১,৮৪২.৮২	—	২,৬২৭.৭২	—	৭৬৬.০৮	১৫,২৩৬.৬২
১০.	মৌলবীবাজার	২৩,০২৪.৪৫	—	৫,১৪৩.৮২	—	৪৩৬.৮৩	২৮,৬০৫.১০
১১.	সুনামগঞ্জ	৩,১৩১.৮৬	—	৭,৫৮০.৯৯	—	—	১০,৭১২.৮৫
১২.	কুমিল্লা	—	—	৬৯৬.৪৫	—	—	৬৯৬.৪৫
১৩.	ফেনী	—	—	৭৭.৪৭	—	—	৭৭.৪৭
১৪.	চট্টগ্রাম	৮৭,৪১৪.৭৮	২৫,৫২৫.৯৮	১১,৫২৫.৯৮	৩,১০১.৯৮	—	১২৭,৭২৪.৯০
১৫.	কক্সবাজার	৭৯,৪৪৮.৬২	১৪,০৬৮.৪০	৬,৬১৭.৯৮	—	—	১০০,১৫৪.০৪
১৬.	বান্দরবান	৭৪,৮৪১.৭৬	—	৮.১৫	—	২৭,১২৪.৯৯	১০১,৯৭৪.৯০
১৭.	রাঙামাটি	২৩৪,৫২০.৩৮	—	—	—	২৩,৬৭৯.৮৫	২৫৮,২০০.২৩
১৮.	খাগড়াছড়ি	২৩,১৫১.২৩	—	—	—	১২,৬৫৯.৬৫	৩৫,৮১০.৮৮
১৯.	নোয়াখালী	—	১,৯৩৬.৩৫	২২,৩৯০.৬৪	—	—	২৪,৩২৬.৯৯
২০.	লক্ষ্মীপুর	—	—	৯,৯১৬.২৩	—	—	১,৯১৬.২৩
২১.	পটুয়াখালি	১,৩৯১.৫২	—	৯,৪৫০.৫৬	—	—	১০,৮৪২.০৮
২২.	বরগুনা	৪,৯৭২.১০	--৬,৬৭৮.৩৯		—	—	১১,৬৪৭.৪৯
২৩.	ভোলা	১৬,৭৯২.৯৯		—	—	—	১৬,৭১২.৯৯
২৪.	পিরোজপুর	৫৩০.৯৬	—		—	—	৫৩০.৯৬
২৫.	খুলনা	১৪৪,৬৩৭.৮০	—	—	—	—	১৪৪,৬৩৭.৮০
২৬.	বাগেরহাট	২৭০,৫১০.৩২	—	---	—	—	২৭০,৫১০.৩২
২৭.	দিনাজপুর	৪,৫৫৫.৯০	—	--৩৮৫.৫৮	--২,৬২২.৬৭	—	৭,৫৬৪.১৫
২৮.	ঠাকুরগাঁও	৪৫২.০৮	—	১৬.১৪	৩২৮.৫২	—	৭৯৬.৭৪
২৯.	সাতক্ষীরা	১৬২,২৬৮.৩১	—			—	১৬২,২৬৮.৩৫
৩০.	পঞ্চগড়	১২.৮২	—	.৬৪	৯,৮৮৬.১৩	—	১,৯০০.৩৯
৩১.	নওগাঁ	১৯১.৮০	২,৪০৯.১৮	—	২৩৬.১৯	—	২,৮৩৭.১১
৩২.	রংপুর	৬৭৭.৫১	.৪৫	৪.৮২	৭০১.১৫	—	১৩৮৩.৯৩
৩৩.	নীলফামারি	—	২৬২.২১	৬১১.৪১	২২৬.৬৫	—	১,১০০.২৭
৩৪.	কুড়িগ্রাম	১৯.৯৯	—	১.৪৭	—	—	২১.৪৬
৩৫.	লালমনিরহাট	৩৩.৪৪	—	.৮১	—	—	৩৪.২৫
৩৬.	গাইবান্ধা	—	—	.৭৫	—	—	.৭৫
	সর্বমোট	১,১৭৭,৫৪১.১৫	৬৩,৪২৪.২৭	১,২৯,৭৫৫.৩৯	২৮,১৯০.৪৯	৬৫,০১৬.১৫	১,৪৬৩,৯২৮.৫৫

রাষ্ট্রীয় বনভূমির চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ৪৭ শতাংশ, সুন্দরবন ও পটুয়াখালি উপকূলীয় এলাকায় ২৭ শতাংশ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে ২ শতাংশ। অন্য সব রাস্তা, বাঁধ ও অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বনভূমির ৬৫ শতাংশ (১৪ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর) সরকারি নিয়ন্ত্রণে এবং অবশিষ্ট বনভূমি স্থানীয় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২০০ বর্গমিটার। ভারতে ১০০০, ফিলিপাইনে ২০০০, ইন্দোনেশিয়ায় ৬৮০০, মায়ানমারে ৮০০০ ও ভুটানে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ ১৫০০০ বর্গমিটার।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ জার্নাল অব ফরেস্ট সাইন্স (Bangladesh Journal of Forest Science)-এ "ফরেস্ট সয়েলস অব বাংলাদেশ" (Forest Soils of Bangladesh) শীর্ষক নিবন্ধে মীর মোহাম্মদ হোসেন লিখেছেন যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল তিন ধরনের মাটিতে অবস্থিত :

১. উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ;
২. কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পশ্চিমাংশের উচ্চভূমি ; এবং
৩. পূর্ব ও দক্ষিণাংশের উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চল।

বরিশাল, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালি ও নোয়াখালিতে কৃত্রিম বনাঞ্চলের পরিমাণ ০.১ মিলিয়ন হেক্টর এবং খুলনা, পটুয়াখালি ও চকোরিয়া সুন্দরবনাঞ্চলের পরিমাণ ৫.৮ মিলিয়ন হেক্টর। প্রধান বৃক্ষ হলো কেওড়া, সুন্দরী, গেওয়া, পশুর ও কান্দ্রা।

কৃত্রিম বনাঞ্চলে লাগানো হয় কেওড়া, গেওয়া, কান্দ্রা ও সুন্দরী বৃক্ষ।

ভাওয়াল-মধুপুর গড়ে শালবন রয়েছে ৯৮০০০ হেক্টর ও বরেন্দ্র গড়ে ১৫০০০ হেক্টর। এখানে রয়েছে হারগাজা, গডিলা, বহেড়া, জিগা, সিধা, চাঁপালিশ, কড়ই, সোনালু ইত্যাদি বৃক্ষ।

পার্বত্য বনঞ্চলের মধ্যে ০.৫৯ মিলিয়ন হেক্টর চট্টগ্রামে, ০.২৬ মিলিয়ন হেক্টর পার্বত্য চট্টগ্রামে, ৪৪০০০ হেক্টর সিলেট ও ৭৫০ হেক্টর কুমিল্লায়।

পার্বত্য বনাঞ্চলে ৭৫০০ হেক্টর ভূমিকে টিক, জারুল, গামারি, ইউক্যালিপটাস, গর্জন, একাশিয়া ও জাম গাছের অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। প্রতি বছর ১০,০০০ হেক্টর জমি গাছ চাষের আওতাভুক্ত করা হয়।

পার্বত্যাঞ্চলে প্রধান প্রধান গাছ হলো—চাঁপালিশ, চুণ্ডুল, তেলশুর, নারকেল,পিতরাজ, কনক, তুন, নাগেশ্বর, জাম, উরিয়াম, সিভিট, গর্জন, তালি, কামদেব, চম্পা, রীকটান ও গামারি। পত্রঝরা গাছের মধ্যে রয়েছে শিমূল, বান্দরহোলা, কড়ই, চিকরাশি, আমড়া ও পিঠালি।

বাঁশের মধ্যে প্রধান প্রজাতিগুলো হলো—মূলী, মিতিংগা, ভুলু ও ওরাহ। চাষ করা ফল গাছ হলো—জাম, কুল, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, তেঁতুল, তাল, খেজুর, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি" (নিবন্ধটি জুলাই-অক্টোবর, ১৯৯৪ ভল্যুম ২৩ ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)

বাংলাদেশের বনাঞ্চল বিষয়ক পূর্বে প্রদত্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন পরিচালিত "সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট অব ফরেস্ট রিসোর্স অব বাংলাদেশ" (Sustainable Development of Forest Resource of Bangladesh) শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। এই প্রজেক্ট পরিচালনা করেছিলেন প্রফেসর জাকের হোসেন ১৯৯০ সালে।

উপরিলিখিত ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন পরিচালিত জরিপ মতে বর্তমানে বাংলাদেশে বন ধ্বংসের হার প্রতি বছর ৮০০০ হেক্টর। অতীতের বনাঞ্চলের ৩৫–৪৫ শতাংশ ইতোমধ্যে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। পুরো বনভূমির অর্ধেক বৃক্ষ আচ্ছাদিত ও বাকী অর্ধেক উষর। বর্তমান বনসম্পদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বা গরান বনাঞ্চলের ৬ লক্ষ হেক্টর পরিমাণ ভূমি। মিশ্র পাতাঝরা বা পাহাড়ি বন ৬ লক্ষ হেক্টর। সমতলের শালবন ১ লক্ষ ২৫০০০ হেক্টর। বসতবাড়ি, পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি গ্রামীণ ও কৃত্রিম বনাঞ্চল ২ লক্ষ ৭০,০০০ হেক্টর।

এখন বাংলাদেশের মূল বনাঞ্চলসমূহের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করতে পারি। যেহেতু ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, বিশেষত খুলনা-সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বা গরান বনাঞ্চল এবং সবচেয়ে সম্পদশালী বনাঞ্চল সেহেতু এটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দাবি রাখে। ম্যানগ্রোভ অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করা হবে পরে। এ পর্যায়ে একে একে অন্য বনাঞ্চলগুলোর অবস্থা দেখা যাক।

২.৩. খোলাবন বা শালবন

বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত ভাওয়াল ও মধুপুর শালবনের জন্য বিখ্যাত ছিলো। এখন যা রয়েছে তা পূর্বেকার অবশেষ মাত্র। ভাওয়াল-মধুপুর গড়ে এখন প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে শালবন রয়েছে। এছাড়া বরেন্দ্র গড়ে রয়েছে বিশ-পঁচিশ লক্ষ হেক্টর শালবন। শালবনের অবস্থা ভালো নয়। বনের ভিতরে জনবসতি গড়ে ওঠায়, কৃষিজমি পত্তন করায় এবং নগরায়নের ফলে শালবন ধ্বংসের মুখে।

২.৪. মৌসুমী বা মিশ্র পাতাঝরা বনাঞ্চল

পাহাড়ে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বন ও বনবিভাগ সৃষ্ট বন-এর আওতায় গড়ে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবন, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে এই বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সর্বমোট ৬ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে বনবিভাগের রোপণ করা বন হলো এক লক্ষ আঠার হাজার ৪০০ শত হেক্টর। সেগুন, গর্জন, গামারি, মেহগনি, রাতা, চম্পা ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ব্লকে লাগানো হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় এই বন বেশ ঘন। এই গাছপালার বেশির ভাগই বছরে একবার পাতা ঝরায়। বড়ো বড়ো গাছের নিচের মাটি সূর্যের আলো পায়। ফলে সেখানে প্রচুর বীরুৎ, গুল্ম ও লতাজাতীয় গাছ জন্মায়। ক্রমে কৃত্রিম বনও ঘন বনে পরিণত হয়।

২.৫. গ্রামীণ বন

বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে গ্রামীণ বন রয়েছে। মানুষ বসতভিটে, পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাড়ে এসব বন গড়ে তুলেছে। জ্বালানির শতকরা ৮০ ভাগ এই বনের কাঠ থেকে ব্যবহৃত হয়।

২.৬. অশ্রেণিভুক্ত বন

পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে এবং চট্টগ্রামের কিছু অংশে প্রায় ৭ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর অশ্রেণিভুক্ত বন রয়েছে। এখানে কিছু কিছু বাঁশ, ছন, ছোট গাছ ইত্যাদি জন্মায়।

২.৭. ম্যানগ্রোভ বা গরান বনাঞ্চল

মৃদু লোনা জলে জন্মানো উপকূলীয় বা নদীর বদ্বীপীয় চিরসবুজ বনাঞ্চল। বাংলাদেশে তিনটি জায়গায় এই বনভূমি রয়েছে। 'সুন্দরবন' শব্দটি বিশেষ অর্থবোধক বলে এখানে সর্বত্র সুন্দরবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটি সুন্দরবন হলো :

১. চকোরিয়ার সুন্দরবন;
২. টেকনাফের সুন্দরবন ; এবং
৩. খুলনার সুন্দরবন।

২.৭.১. চকোরিয়া সুন্দরবন : চকোরিয়া সুন্দরবন মাতামুহুরী নদীর বদ্বীপের কেন্দ্রীয় অংশ জুড়ে অবস্থিত। প্রায় ৭৫০০০ হেক্টর জমি জুড়ে এই বন। এখানে ২০ প্রজাতির গাছ রয়েছে। গাছের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১২ মিটার। চন্দ্রকাট্রা ও ধলকাচাই প্রধান গাছ। নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ও চিড়িং চাষের কারণে এই বন বিলুপ্তির পথে। বনের অসহায় জীবজন্তু শিকারিদের নিষ্ঠুর লালসার শিকার।

২.৭.২. টেকনাফের সুন্দরবন : বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী থেকে রাইমঙ্গল নদী পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলে এই বনাঞ্চল বিস্তৃত। টেকনাফের কাছে জলিয়ার দ্বীপে ৩০০ হেক্টর কেওড়াবন রয়েছে।

২.৭.৩. খুলনার সুন্দরবন : সুন্দরবন বলতে পৃথিবীর সবখানের মানুষ খুলনায় অবস্থিত সুন্দরবনকেই জানে। এই সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বা গরান বনাঞ্চল। আয়তনের দিক থেকেই নয় শুধু, বনজ সম্পদের পরিমাণ ও এই সম্পদ আহরণের দিক থেকেও সুন্দরবন অনন্য হিসেবে বিবেচিত। সুন্দরবন নামের ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত রয়েছে। একটি মত হলো বনটি দেখতে সুন্দর, তাই এর নাম সুন্দরবন। নামটি সমুদ্রবনের অপভ্রংশও হতে পারে। অর্থ সমুদ্র তীরের বন। আর একটি মত হলো নামটি এসেছে চন্দ্রদ্বীপ বন থেকে। চন্দ্রদ্বীপ খুলনার একটি পুরনো মহকুমা বাখেরগঞ্জের জমিদারির নাম। অনেকের ধারণা, নামটির সম্বন্ধ রয়েছে চান্দাভান্দা নামক বনের আদিবাসীদের সঙ্গে। এরা বাখেরগঞ্জে লবণ তৈরি করতো। আদিবাসীদের কথা বাখেরগঞ্জের উত্তরাঞ্চলে আদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে লেখা আছে। গ্রান্ট সাহেব নামটি সংগ্রহ করেছেন চন্দ্রবাঁক থেকে। চন্দ্রবাঁক অর্থ চাঁদের

চারদিকে বাঁধ। তিনি বলেছেন, সুন্দরবন চন্দ্রদ্বীপের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত, এটি চাঁদের সন্তান ও জোয়ারের জলে সিক্ত। যাহোক, বর্তমানে মনে করা হয়, নামটি এসেছে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ থেকে। পূর্বে সুন্দরবনে সুন্দরী গাছই সংখ্যায় বেশি ছিলো।

গঙ্গা নদীর অববাহিকায় দশ লক্ষ হেক্টর এলাকা জুড়ে পুরো সুন্দরবন এলাকা অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। বাংলাদেশ অংশে পড়েছে পুরো বনের বাষট্টি শতাংশ। বাংলাদেশের অংশটি রয়েছে নিরক্ষরেখার পূর্বে ৮৯°০০ থেকে ৮৯°৫৫ দ্রাঘিমাংশ এবং উত্তর ২১°৩০ থেকে ২২°৩০ অক্ষাংশের মধ্যে। সুন্দরবন বর্তমানে বাংলাদেশের তিনটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত। জেলাসমূহ হলো—বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা। বনাঞ্চলের আয়তন ৫,৭৭,০০০ হেক্টর। এর মধ্যে স্থলভাগ ৪,০১,৬০০ হেক্টর। অবশিষ্ট নদী, খাল, ঝাঁড়ি মিলিয়ে ১,৭৫,৬০০ হেক্টর জলভাগ। কোনো জলাভূমির বিস্তার কয়েক মিটার। আবার কোনোটির বিস্তার কয়েক কিলোমিটার। অধিকাংশ খাল ও ঝাঁড়ি নদীর সঙ্গে যুক্ত। এ কারণে বনাঞ্চলের প্রায় সব জায়গাতেই নৌকাযোগে যাওয়া সম্ভব। ৪,০১,৬০০ হেক্টর স্থলভাগের মধ্যে মাত্র ৬১০০ হেক্টরে বড় গাছপালা নেই। এখানে রয়েছে ঝোপঝাড় ও ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ।

১৯১৪ সালে প্রকাশিত ওমালীর গেজেটিয়ারে গাঙ্গেয় বদ্বীপের ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক বিবরণ আছে। দেখা যায়, মহাভারত ও পুরাণে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। অঞ্চলটি অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশ সুহমা রাজ্য ও পূর্বাংশের বঙ্গ রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাবধি এই এলাকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৪৯৫ সালে রচিত বিপ্রদাসের কবিতা ও ১৫৮২ সালে রচিত আইন-ই-আকবরি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। বিপ্রদাসের কবিতায় চাঁদ সওদাগরের বর্ধমান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণের বর্ণনা আছে। চাঁদ সওদাগর আদি গঙ্গা দিয়ে সমুদ্র অভিমুখে গিয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরির টোডরমলের রাজস্বপঞ্জি থেকে জানা যায়, ২৪ পরগণা জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) সাতগাঁও রাজস্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বিভাগটি ছিলো সাগরদ্বীপ থেকে পলাশী পর্যন্ত। লেখা আছে, কলকাতা আর দুটি মহলের রাজস্ব আদায় হতো বার্ষিক ২৩,০০০ টাকা।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুন্দরবনের সত্যিকার শাসক ছিলেন বার ভূঁইয়ার একজন হিন্দু প্রধান প্রতাপাদিত্য। গাঙ্গেয় বদ্বীপে বার ভূঁইয়া দিল্লীর সম্রাটের সামন্ত হওয়া সত্ত্বেও আসলে স্বাধীন ছিলেন। ভূঁইয়ারা যে সংখ্যায় বার জন ছিলেন, সে বার জন যে একই সময়ে ছিলেন এমনটি সঠিকভাবে বলা যায় না। ভূঁইয়াদের শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলা হতো। ওয়াইজ সাহেব সাত ভুঁইয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, ভাওয়ালের ফজল গাজী, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য, চন্দ্রদ্বীপর বা বাকলার কন্দর্প নারায়ণ, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোরের বা চান্দেখানের প্রতাপাদিত্য ও ভূষণার মুকুন্দরাম রায়।

দায়ুদ পাঠান আমলের বাংলার শেষ রাজা। তাঁর সময়েই যশোহর রাজ্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও কাকা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্যের

প্রতিষ্ঠতা। তাঁদের প্রকৃত নাম শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ। দায়ুদই তাঁদের ঐ উপাধি দেন। দায়ুদ আকবরের সেনাপতি মুলেম খাঁর আক্রমণে যখন পর্যুদস্ত তখন বিক্রমাদিত্য দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত চাঁদ খাঁর জায়গীরের খুলনা জেলার যশোহর এলাকা দায়ুদের কাছে প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন। এলাকাটি ছিলো নদীবহুল, জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্গম। বসন্ত রায় বহু নৌকা, রসদ ও লোকজন নিয়ে গঙ্গা থেকে হুগলী–ত্রিবেনীর কাছে যমুনায় প্রবেশ করে যশোহরে পৌঁছান। কালীগঞ্জের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ঈশ্বরীপুরে জঙ্গল কেটে নূতন রাজ্যের পত্তন করা হয়। দায়ুদ পরাজিত হলে বাংলা দিল্লীর শাসনাধীন হয়। বিক্রমাদিত্যই তখন দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাতেন। ১৫৮২ সালে বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য নূতন সনদ পান। কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি এই শতকের শেষে সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন। তাঁদের বিবরণেও প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রমাণ আছে। এ সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন দিল্লীর প্রতিনিধি টোডরমল। টোডরমল ১৫৮০ সালে বাংলার বিদ্রোহ দমন করে এই সনদ লাভ করেন। পণ্ডিত বিভারিজ যশোহর বা চান্দেখানকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী খুলনা জেলার কালিগঞ্জের কাছে ধুমঘাট হিসেবে শনাক্ত করেন।

পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণ দিকের তো কথায়ই নেই, প্রতাপকে "সুন্দরবনের বাঘ" বলা হতো। সমস্ত সুন্দরবন তাঁর দখলে ছিলো। পূর্ব দিকে বালেশ্বর নদ পর্যন্ত ছিলো তাঁর রাজ্যের সীমানা। পশ্চিম সীমানা ছিলো ভাগিরথী নদী পর্যন্ত। দক্ষিণে হিজলী জয়ের পর তাঁর রাজ্য উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

প্রতাপের সঙ্গে মুগলদের যুদ্ধ বাধে। সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপকে যুদ্ধে পরাস্ত করলে প্রতাপ মুগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এ সময়ে আবুল ফজলের ভগ্নীপতি ইসলাম খাঁ বাংলার নবাব ছিলেন। প্রতাপের শেষ যুদ্ধ জাহাঙ্গীরের সময়ে। প্রতাপ ও তাঁর ছেলে উদয়াদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হন। প্রতাপ বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সুন্দরবনের পরের ইতিহাস ইংরেজ ও মুঘলদের সংঘাত নিয়ে রচিত। ১৬৮৭ সালে চার্নক সুতানুটীতে ঘাঁটি বসান। কিন্তু নবাবের সৈন্যরা তাঁদের তাড়িয়ে দিলে তাঁরা জাহাজে আশ্রয় নিয়ে হুগলী নদীতে ভেসে চলেন। ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে হিজলীর কর্দমাক্ত ভূমি ও খাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নেন। পথে তাঁরা তান্না দুর্গ (বর্তমানে কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের স্থানে) দখল করেন। ১৬৮৭ সালেই ইংরেজরা নবাবের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক তান্না পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৬৯০ সালে তাঁরা দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে নূতন অনুমতি লাভ করেন। অবশেষে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট রবিবারের দুপুরে চার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজরা সুতানুটী বা কলকাতায় আগমন করেন। কলিকাতার ঠিক দক্ষিণেই ছিলো জলা ও জঙ্গল। ম্যালেরিয়া ছিলো প্রধান শত্রু। পত্তনকারীদের অনেকেই মারা যান।

কলিকাতার দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার থেকে বাদাবনের শুরু। এটা ১৭৬৫ সালের কথা। এ সময়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কাটা শুরু হয়। উদ্দেশ্য চোরা কারবারি, জলদস্যু ও বন্যজন্তু থেকে বনকে উদ্ধার করে লাভজনক রাজস্ব উৎপাদক জমিতে পরিণত করা। ১৭৭০ সালের

কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলের সময় থেকে চাষের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হয়। এর জন্য রাজস্ব দিতে হতো না। ৪০ বছরের মধ্যে দক্ষিণে সাগরদ্বীপ, পূর্বে ক্যানিং পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা আবাদ হয়। এটি সুন্দরবনের উত্তরাংশের ব্যাপার।

সুন্দরবনের পূর্বাংশে আবাদের কাজে নিয়োজিত হন যশোহরের কর্মকর্তা টিলম্যান হেঙ্কেল। ১৭৮৫ সালে হেঙ্কেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অনুমতি নিয়ে ছোট ছোট জমি সরাসরি চাষীদের মধ্যে বিলি করেন। জমিদারদের চক্রান্তে এই ব্যবস্থায় সুফল আসেনি। ১৮১৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুন্দরবনের জমি দখলকারীদেরকে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত আংশিক কার্যকরী হয়। ১৮১৬ সালে নূতন আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী সুন্দরবনের কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। প্রথম কমিশনার হয়েছিলেন স্কট সাহেব। কমিশনার দেখলেন জমিদার, ইজারাদার ও অন্যরা রাজস্ব আদায় করছে না। ১৮১৭ সালে এক আইনে সুন্দরবনকে সরকারি সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। প্রিন্সেপ সাহেব ১৮২২-২৩ সালে বাংলাদেশের যমুনা নদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদী পর্যন্ত সমস্ত বনাঞ্চল জরিপ করেন। তিনি মরিসনের ম্যাপের সাহায্যে বনকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করেন। ১৮২৮ সালের মধ্যে জবরদখলকৃত সকল জমি উদ্ধার করা হয়।

স্কটের পর কমিশনার হন উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার এবং জরিপকর্তা হন হজেস। ১৮২৯-৩০ সালে তাঁরা পুরো সুন্দরবন জরিপ করেন। ১৮৩২-৩৩ সালে ড্যাম্পিয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ২৪ পরগণার প্রিন্সেপ লাইনকে স্বীকার করেন। প্রিন্সেপ লাইন ও হজেস লাইন সুন্দরবন অঞ্চলের প্রামাণ্য উত্তর সীমা। হজেস-এর ম্যাপই অদ্যাবধি সুন্দরবনের প্রামাণ্য ম্যাপ। এই ম্যাপে পশুর নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ২৩৬ লটে বিভক্ত। ১৮৩০ সালে বন এলাকা বন্দোবস্ত দেওয়ার সরকারি নিয়মাবলি তৈরি হয়।

বন পরিষ্কার করে আবাদ করার কাজটি ছিলো খুব কঠিন। ক্যালক্যাটা রিভিউ-তে এই কাজের বিবরণ এরকম : বনের এলাকা শ্রমিক লাগিয়ে আবাদ করা হতো। নয়তো চাষীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। প্রথমে জমির চারদিকে বাঁধ দেওয়া হতো। এ জন্যে খালের পাশ দিয়ে গাছ কেটে বাঁধ দিতে হতো। লবণাক্ত জল আটকাবার জন্য দরকার হতো খালের মুখে ভারি বাঁধ। এরপর জমির জঙ্গল কাটা হতো। পরে কাটতে হতো পুকুর। পুকুরের পাড়ে কুঁড়েঘর। বাঘের উপদ্রব জঙ্গল কাটার বাধা হতো। এ জন্যে একজন শিকারি থাকতো। শিকারি বাঘকে দূরে রাখার জন্যে মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ দিতো। বাঘ প্রায়ই শ্রমিকদের শিকার করতো। সুন্দরবনের কাঠুরে, ছোট নাগপুরের কুলি, আরাকান (বর্তমান মিয়ানমার) ও চট্টগ্রামের মগ কুলিরা শ্রমিকের কাজ করতো। বাঘ গবাদি পশুও খেয়ে ফেলতো। শূকর ও হরিণ শস্যের ক্ষতি করতো। আর একটি বড় বাধা ছিলো এই অঞ্চলের কঠিন জ্বর। মাঝে মাঝে শ্রমিকরা পালিয়ে যেতো। চড়া দামে আবার শ্রমিক আনতে হতো। কোথাও বাঁধ ভেঙে লবণাক্ত জল ঢুকে পড়তো ও জমি নষ্ট হতো।

১৯০৪ সালে বড় বড় জমি বন্দোবস্ত বন্ধ করে চাষীদেরকে ছোট ছোট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এর আগে ১৮৬২ সালে বর্তমান মায়ানমারের (প্রাক্তন ব্রহ্মদেশ বা বার্মা) বন

সংরক্ষক ড. ব্র্যান্ডিস সরকারকে বাংলার বন সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। ১৮৭৮–৭৯ সালে ৪৮৫৬ বর্গ কিলোমিটার বন সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। গত একশ বছরে সুন্দরবনের ৫০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল আবাদ হয়েছে। তবে বাংলাদেশ অংশে অর্থাৎ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা তথা বৃহত্তর খুলনার এই বনাঞ্চল প্রায় অক্ষতই রয়ে গেছে। বেশিরভাগ আবাদ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অংশে।

আলোচিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে থেকে মানুষের কাছে সুন্দরবনের গুরুত্ব ধরা পড়ে। নানান দিক থেকে এই বন এক বিচিত্র জগৎ। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকেও এই বনের ভূমিকা বিচিত্র ও অনন্য। এই বনে বৈজ্ঞানিক বন ব্যবস্থাপনার আয়োজন হয়েছিলো প্রায় ১২০ বছর আগে। এই উপলব্ধির বিষয়টি গুরুত্ববহ। কারণ এখনো এশিয়া, আফ্রিকা ও নিরক্ষীয় ল্যাটিন আমেরিকাসহ অনেক দেশে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে লাভজনক মনে করা হচ্ছে না। সুন্দরবনে প্রায় ৩৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ, প্রায় ১০ প্রজাতির উভচর, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৭০ প্রজাতির পাখি ও ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সমগ্র বাংলাদেশে প্রাপ্ত সংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ সরীসৃপ, ৩৬ ভাগ পাখি ও ৩৩ ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী সুন্দরবনেই বাস করে। এই বনেই কেবল রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার *(Panthera tigris tigris)* ও মোহানার কুমির *(Crocodylus porosus)* ।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিসহ বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের বনজসম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস এই গরান বন। এই বনভূমি দেশের শতকরা ৪৫ ভাগ মূল্যবান কাঠ ও জ্বালানি–কাঠের সংস্থান করে। বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করে সুন্দরবন। এ ছাড়া কাগজের মণ্ড তৈরির কাঠ, শুকনো খড়কুটো, ঘর ছাওয়ার ঘাস–পাতা, মধু, মোম, মাছ, কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী, চিংড়ি, শামুকজাতীয় প্রাণী ইত্যাদিরও অফুরন্ত ভাণ্ডার এই বনাঞ্চল। বন বিভাগের গণনা মতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ মানুষ এই বনে কাজ করতে যায়। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা লাখের উপরে। বাংলাদেশের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কাগজ তৈরির কারখানাটি কেবল সুন্দরবনের কাঠের উপর নির্ভরশীল। তদুপরি এই বনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে কাঠ–নির্ভর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। দুবলা দ্বীপ বনের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। শীত মৌসুমে এখানে বিস্তর মাছ ধরা হয়। শুটকীও তৈরি হয়। হাজার হাজার জেলে এখানে অস্থায়ী ঘর বাঁধে।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ এই সুন্দরবনের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য শত শত বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রেখেছে মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো নদী, খাল, খাঁড়ি, নদীর মোহানা ও সমুদ্রের জোয়ার–ভাটা। নদী, খাল সম্পর্কে আলোচনা শুরুর আগে এই বনের প্রকৃতি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, ভূগঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সুন্দরবন কর্কট ক্রান্তি রেখার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের একেবারে উত্তরাংশে অবস্থিত। বনের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী একে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র বনাঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে

সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারিতে এবং সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে মে থেকে জুন মাসে।

ছয় ঋতুর দেশ আমাদেরই বাংলাদেশ। কিন্তু সুন্দরবনে চার-ঋতু আছে ধরা হয়। (১) প্রাক বর্ষা (মার্চ থেকে মে), (২) বর্ষা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর), (৩) বর্ষা-উত্তর (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) ও (৪) শীত (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)। বর্ষা-উত্তর ঋতুতে দক্ষিণা বাতাস বয়, তাপ থাকে উচ্চ মাত্রায় এবং অতিরিক্ত বাষ্পীকরণ সংগঠিত হয়। এ সময় মাঝে মাঝে বজ্রপাত ও সমুদ্রে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে জোয়ারের স্ফীতি ঘটে, জোয়ারের জলে বহু এলাকা জলমগ্ন হয়। ফলে এই ঋতুতে নদীর জলে লবণের পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাত হয় বেশি, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে, আকাশ জুড়ে থাকে মেঘের ঘনঘটা। স্থলভাগে ভারি বৃষ্টির কারণে নেমে আসা জলস্রোতের সাথে বিপুল পরিমাণ কাদা-মাটি সুন্দরবনের বনাঞ্চলে এসে জমা পড়ে। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শুখা শীত ঋতুতে ঠাণ্ডার দাপট। আকাশ মেঘমুক্ত। দিনে চমৎকার সোনালি রোদের ঝিলিক। এই ঋতুতে নদীতে লবণের পরিমাণ কমে যায়। বর্ষায় বৃষ্টিপাত মোট বৃষ্টিপাতের ৮০-৮৫%। সুন্দরবনের পূর্বাংশে বছরে গড়ে ২০০০ মিলিমিটার এবং পশ্চিমাংশে ১৬০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। ভারি বৃষ্টিপাতের সময় জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। উচ্চ তাপমাত্রা থাকে মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত। শীত ডিসেম্বরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাতক্ষীরা অংশে ৩১.৩°সেলসিয়াস এবং গড় তাপমাত্রা ২৯.৪° সেলসিয়াস। একেবারে সর্বাধিক তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পটুয়াখালি অংশে ৩২°৪। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৮০%। সুন্দরবনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বয় মধ্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। মার্চ থেকে অক্টোবরে আসে দক্ষিণ মৌসুমী বায়ু। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হয় জানুয়ারিতে। সুন্দরবনের পরিবেশ খুবই শান্ত থাকে ফেব্রুয়ারিতে। এ সময় দিনের বেশির ভাগে থাকে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব দেখা যায় অক্টোবর ও নভেম্বরের শুরুতে। মে ও জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ হয়।

সুন্দরবনের ভূগঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলো গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবাহিত পলি। এর মধ্যে বেশি পলি এসেছে হিমালয় থেকে গঙ্গা নদী দিয়ে। এ ছাড়া এখানে ঊর্ণনাভের জালের মতো ছড়ানো নদী, খাল, খাঁড়ি, আড়াআড়ি নদী ও খালবাহিত পলি তো আছেই। বৃষ্টিও আশপাশের স্থলভাগ থেকে পর্যাপ্ত পলির যোগান দেয়। তদুপরি ভূকম্পন ও নানান ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে ভূগঠনে নানান মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। সম্প্রতি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নানা ধরনের পরিবর্তনের ভূমিকাও গৌণ নয়। মানুষ স্থলভাগে ও জলভাগে বহু ধরনের পরিবর্তন সাধন করে চলেছে প্রায় ৫০০ বছর ধরে। জৈববর্জ্যও পলির সঙ্গে মিশে ভূমিরূপে নানান রাসায়নিক পরিবর্তন এনেছে।

প্লিস্টোসিন পিরিয়ডের শেষে গঙ্গা ও এর শাখা নদী কলিকাতার পশ্চিমে সুন্দরবনের সৃষ্টি করতে থাকে। পরে গঙ্গা ক্রমে পূর্বে সরে যায় এবং যশোহরের দিকে অববাহিকা সৃষ্টি করে তা

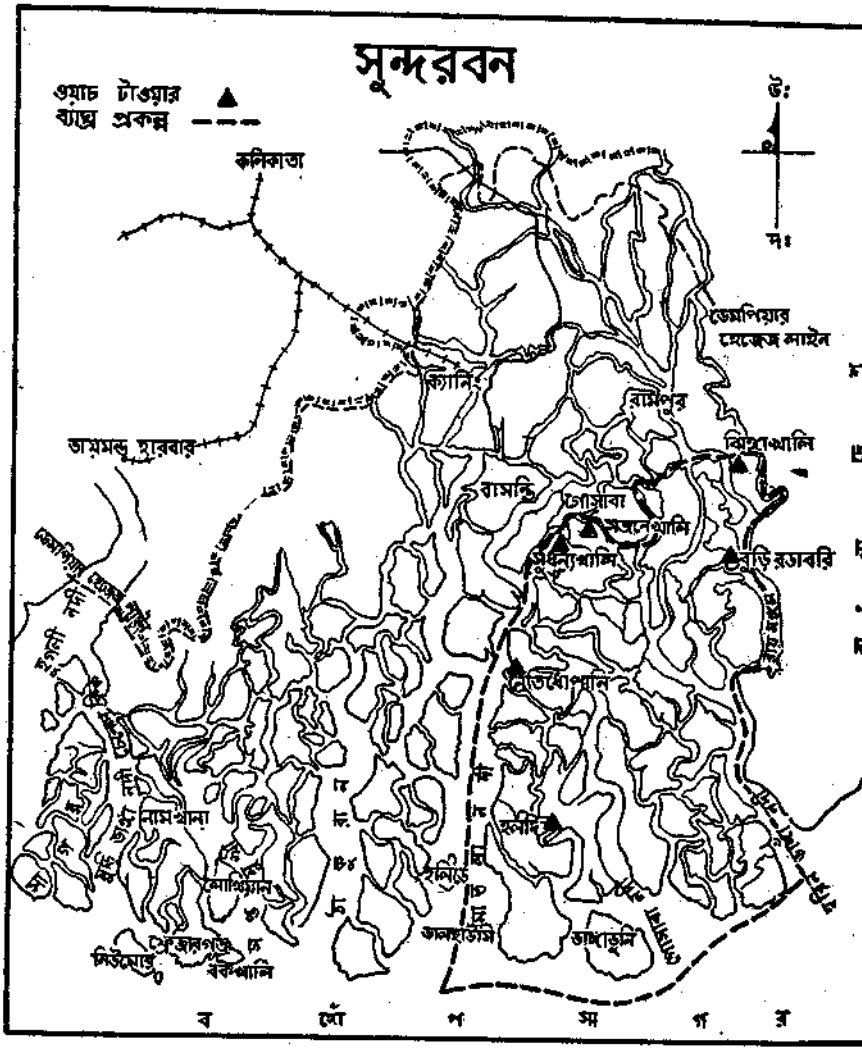

সুন্দরবন
ওয়াচ টাওয়ার
ব্যাঘ্র প্রকল্প
উঃ
দঃ
কলিকাতা
ক্যানিং
ডায়মন্ড হারবার
বাসন্তি
গোসাবা
সজনেখালি
নামখানা
বকখালি
ব ঙ্গো প সা গ র

চিত্র ৫ : সুন্দরবন

বর্তমান সুন্দরবন পর্যন্ত গড়ায়, সে সময়ে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র পূর্বে বরিশাল অঞ্চলে অববাহিকা গড়ে তুলে।

পনের শতকে বা ষোল শতকে ভাগিরথী হুগলী স্রোতপ্রবাহ ডানে প্রবাহিত হতো। অতীতে বাম দিকে প্রবাহিত কিছু শাখাও ডানে সরে আসে। গঙ্গাও পূর্বদিকে অর্থাৎ ডানে ক্রমেই সরে যেতে থাকে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান সুন্দরবন হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এ সময়ে গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সংযোগ ছিলো না। শেষোক্ত নদীদ্বয় বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বে এসে মিলিত হয়।

১৭৬২ ও ১৭৮২ সালে দুটো বড় ভূমিকম্পে এবং ১৮৮৭ সালে বড় বন্যার কারণে বামে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা পূর্বে সরে যায় এবং গঙ্গার পরিবর্তে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশে। এর কয়েক বছর পর ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমে সরে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গিয়ে বিশাল পদ্মা নদীর জন্ম দেয়। এ সকল পরিবর্তন সাধিত হয় ১৮৩০ সালের দিকে। গঙ্গার অববাহিকা গঠনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ফলে সসার আকৃতির বা থালার আকৃতির এই বদ্বীপ গড়ে উঠে। বদ্বীপের বাইরের দিকটা কিছু উঁচু, ভিতরে নিচু অংশের সৃষ্টি হয়। নিচু অংশে বছরের প্রায় সময় অল্পবিস্তর পানি জমা থাকে। এখানেই গড়ে উঠে এই সুবিখ্যাত গরান বন।

নদীসমূহ স্থলভাগ ও পর্বত থেকে বিস্তর পরিমাণ কাদা, নুড়ি, পাথর বয়ে এনে বদ্বীপে জমা করে। প্রমত্ত প্রবাহকালে কর্দম জলে ভাসমান থাকে, কিন্তু নদীর শান্ত অবস্থায় তা নদীর কিনারা ও মোহানায় এবং উত্তল অংশে জমা পড়ে। ফলে নদীর কিনারা ও মোহানার কিনারা উঁচু হতে থাকে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি পাড় ছাপিয়ে ভিতরে আসে। ভাটার টানে পানি নেমে গেলেও সব পানি নামতে পারে না। কোথাও পানিতে বাঁধ পড়ে গেলে নদী বা খাল অন্যদিকে মোড় নেয়। এভাবে সুন্দরবনের ভিতরে নিত্যনূতন জলের খাত সৃষ্টি হতে থাকে। নিয়ত পরিবর্তনশীল নদী ও খাল সুন্দরবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য নদী, খাল ও খাঁড়ির এই জাল বিস্তৃত রয়েছে ১,৭৫,৬০০ হেক্টর স্থান জুড়ে। বড় জলপ্রবাহকে নদী বা গাঙ, তুলনামূলকভাবে ছোট জলখাতকে খাল এবং এর চেয়ে ছোট স্রোতধারাকে খাঁড়ি বলা হয়। সাধারণত নদীগুলো প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নদীসমূহ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, আড়াআড়ি গড়ে ওঠা নদী দ্বারা। যেগুলোকে শাখা নদী বা ভাবনী বলা হয়ে থাকে। বড় নদীগুলো সমুদ্রে গিয়ে মিশে। মোহানায় গড়ে উঠে অববাহিকা। মোহানায় কোনো কোনো নদীর বিস্তৃতি প্রায় ১০ কিলোমিটার। পশুর, সিপসা ও রাইমঙ্গল নদী বেশ প্রশস্ত ও গভীর। সুন্দরবনকে চারটি অববাহিকায় মূলত ভাগ করে নদীর জলবণ্টন দেখানো হয়ে থাকে। অববাহিকা চারটি হলো বাঙ্গরা, কুঙ্গা, মালঞ্চ ও রাইমঙ্গল।

বাঙ্গরা অববাহিকা গঠিত হয়েছে পশুর, কাগা, বড় শৈলা, সেলা ও ভোলা নদীর শাখা-প্রশাখা দিয়ে। নদী ও খালের জালে সৃষ্ট বাঙ্গরা মূলত পশ্চিমে পশুর ও পূর্বে বালেশ্বর নদীর সঙ্গে যুক্ত। সেলা ও ভোলা নদী ভৈরব নদীর মাধ্যমে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসে। ভোলা নদী দেবরাজ অঞ্চলের কাছে ভৈরব নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভোলা বালেশ্বর মধুমতীর মিলিত স্রোতধারা থেকে জিওধারা ও ধানসাগর খালের মাধ্যমে মিঠাপানি সংগ্রহ করে। সেলা নদী

খরমা ও আরাইবাঁকি খালের মাধ্যমে বালেশ্বর-মধুমতী স্রোতধারা থেকে মিঠা পানি সংগ্রহ করে। পশুর নদীর সঙ্গে বহু জায়গায় সংযোগ খালের মাধ্যমে সেলা নদী যুক্ত। বিশেষ করে চানচান গাঙ ও মিরগামারি খালের মাধ্যমে সেলা পশুর নদীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। সেলা আরো দক্ষিণে চারাপুটিয়া, কাগাবাগা ও জাফার ইত্যাদি নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। আগে পশুর ও ভোলা নদীর সঙ্গে খুরমা খাল দ্বারা সেলা যুক্ত ছিলো। বর্তমানে সেলা পূর্ব দিকে ভোলা নদীর সঙ্গে অরুয়ারের ও আরাইবাঁকি খাল দ্বারা যুক্ত এবং পাথুরিয়া খাল দ্বারা হরিণথানার সঙ্গে যুক্ত। বাঙ্গরা অববাহিকা ডোরা, আরকেডালিয়া কাটকা ও সুপতি খাল দ্বারা বালেশ্বর নদীর সঙ্গে যুক্ত। একটি কৃত্রিম খাল দ্বারাও ভোলা নদী ও বালেশ্বর নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। পাথুরিয়া খালের মাঝামাঝি জায়গা থেকে উদ্ভূত বেতমার গাঙও এই অববাহিকায় জল সরবরাহ করে। খুরমা একসময় সুন্দরবনের উত্তর সীমানা জুড়ে বিস্তৃত ছিলো। এই খাল বর্তমানে পুরোটাই ভরাট হয়ে গেছে।

পশুর ও শিবসা এক হয়ে মর্দদ নদী গঠন করেছে এবং মর্দদ নদী কুংগা নদীর সঙ্গে মিশেছে। কুংগা নদী সুন্দরবনের ভিতরে এসে হিরণ পয়েন্টের কাছে হংসরাজ ও কাগা খালের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। কাগা কুংগা অববাহিকা ও বড় পাংগার সংযোজক খাল। সুন্দরবনের বৃষ্টির জল বহনকারী বহু নদী পশুর ও শিবসা নদীতে জল সরবরাহ করে যা কুংগা অববাহিকায় আসে। খুলনার ভৈরব নদীর একটি স্রোতধারা হলো পশুর নদী যা আটারাবাঁকি ও নবগঙ্গা নদী দ্বারা গোরাই মধুমতীর মিলিত স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত। গোরাই মধুমতী গঙ্গার একটি মূল স্রোতধারা যা গঙ্গা নদীর পুরো পানির শতকরা ১২ ভাগ পানি বহন করে। সিপসার উৎসস্থল হলো ভেলুটি অঞ্চলে যেখানে বহু বিল থেকে খাল এসে মিলিত হয়েছে। প্রখ্যাত বিলসমূহের মধ্যে রয়েছে সালনা, পাবনা, কাটালিয়া, ডাকাতিয়া ইত্যাদি। খাল কাটার আগে এ সকল জলভূমির জল যেতো ছোট নদী ও খালে। বিলের জলসরবরাহের উপর নির্ভরশীল নদীগুলো হলো বাদুরগাছা, বড় খালি, ডেলুটি ও মিনাজ। নালিয়নের কাছে সুন্দরবনে প্রবেশের আগে সিপাসা নদী ভদ্রা নদী হয়ে পশুর নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভদ্রা দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি শাখার নাম সুতারখালি ও অন্যটি ভদ্রা। সুতারখালি নদী সুন্দরবনের কলাবগি বন স্টেশনের দক্ষিণে প্রবাহিত। অপর শাখা ভদ্রা সুন্দরবনের ভিতরে সুতারখালি স্টেশনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাটিতে পশুর নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। সুন্দরবনের ঢোকার আগে সিপসা নদী কোইরা ও হাডার খালের মাধ্যমে কোবাডাক নদীর স্রোতসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মালঞ্চ নদীকে সুন্দরবনের বাইরে চুনার নদীও বলা হয়। এটি সুন্দরবনে ঢোকার আগে ইছামতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। কদমতলা দিয়ে মালঞ্চ নদী সুন্দরবনে ঢুকেছে। যমুনা নদীর সঙ্গে ফিরিঙ্গী নদীর মাধ্যমে মালঞ্চের সংযোগ ঘটেছে। কোবাডাক নদী দ্বারা আর পাংগাসিয়া ও মালঞ্চ ভৈরব নদীর সঙ্গে যুক্ত। ফলে মালঞ্চ ভৈরব নদীর মাধ্যমে কিছু মিঠা পানির সরবরাহ লাভ করতো। কিন্তু বর্তমানে ভৈরব নদীর সঙ্গে গঙ্গার কোনো সংযোগ নেই।

রাইমঙ্গল অববাহিকা জলের সরবরাহ পায় হরিণভাঙ্গা, রাইমঙ্গল ও যমুনা নদী থেকে। ভারতীয় সুন্দরবন ও বাংলাদেশের সুন্দরবনের আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিত করেছে কালিন্দী

নদী। কালিন্দী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় এর নামকরণ হয় রাইমঙ্গল। ভারতের কিশেনগঞ্জ থেকে উদ্ভূত হয়ে যমুনা বংশীপুরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এখানে এর নাম মদর গাঙ। মদর গাঙ সুন্দরবনের উত্তরাংশ দিয়ে প্রবাহিত। আরো দক্ষিণে মদর গাঙ যমুনা নামে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। যমুনা, মালঞ্চ, ফিরিঙ্গী গাঙ ও রাইমঙ্গলের সঙ্গে আটারবাঁকির মাধ্যমে যুক্ত। এছাড়া এর সঙ্গে আরো বহু খাল যুক্ত রয়েছে।

রাইমঙ্গল অববাহিকায় আরো জল সরবরাহ করে মালঞ্চ নদী ও বড় পাংগা নদী। বল নদী ও আরাপাংগাসিয়া নদী মিলে বড় পাংগা নদীর সৃষ্টি। এই নদীদ্বয় সুন্দরবনের বাইরে থেকে উদ্ভূত অনেক নদী থেকে জলপ্রবাহ পায়। আরাপাংগাসিয়া খুলপেটুয়া ও কোবাডাক থেকে জল সরবরাহ পায় এবং বল নদী জাফার মাধ্যমে শিবসা, আন্দারমানিক খাল ও চকিগাঙের মাধ্যমে কোবাডাক নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ কোবাডাক নদী ও বেতনা নদী থেকে অববাহিকার নদীগুলো জলের সরবরাহ পেয়ে থাকে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ অববাহিকা, যেমন সিপসা ও পশুর নদীর অববাহিকা জলযান চলাচলের উপযুক্ত। এরা মূলত মিঠা জল পায় গোরাই–মধুমতীর মিলিত স্রোতধারা থেকে। বালেশ্বর, হরিণঘাটা অববাহিকা মেঘনার জোয়ার ভাঁটার জলই পায় বেশি। আড়িয়াল খাঁর মাধ্যমে পদ্মা থেকেও কিছু জল পায়। সাধারণত পশ্চিমের মোহানাগুলোতে মুমূর্ষু বদ্বীপের অংশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পূর্বের মোহাগুলোকে সক্রিয় বদ্বীপের শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পশ্চিমের নদীগুলো প্রবলভাবে সামুদ্রিক জোয়ার–ভাটার দ্বারা প্রভাবিত। পূর্বদিকের নদীগুলো শুখা মৌসুমে জোয়ার–ভাটা দ্বারা অধিক প্রভাবিত হলেও, বর্ষা মৌসুমে জোয়ার–ভাটার প্রভাব এতে কম।

সুন্দরবনের জলপ্রবাহকে তিনটি উপধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো : (১) পশ্চিমাঞ্চলীয় উপধারা, (২) কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপধারা ও (৩) পূর্বাঞ্চলীয় উপধারা। পশ্চিমাঞ্চলীয় উপধারা ; শিবসার পশ্চিমাংশ ও রাইমঙ্গলের পূর্বদিক নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এটি মুমূর্ষু কোবাডাক–বেতনা নদীর স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত। এই অঞ্চল গঙ্গার সঙ্গে যোগসূত্র বিবর্জিত। স্থানীয় জলই এর সম্বল। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপধারা ; সিপসার পূর্বে ও পশুরের পশ্চিমের জায়গা নিয়ে এটি গঠিত। এই অঞ্চল গোরাই নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। গঙ্গায় জলপ্রবাহ কমার কারণে পশুর ও গোরাই–এর সংযোগ স্থল মাঝে মাঝে বালির বাঁধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সুন্দরবনের বাইরে পলি জমে নদীর তলা ভরাট হওয়াতে ভাটিতে জলপ্রবাহে অবনতি ঘটেছে। পূর্বাঞ্চলীয় উপধারা ; পশুর নদীর পূর্বে ও বালেশ্বরের পশ্চিমে এই অঞ্চল। এই অঞ্চল গঙ্গা থেকে গোরাই মধুমতী ও মেঘনার ভাটি থেকে মিঠাপানি পায়। সামান্য জায়গা ছাড়া সুন্দরবনের বাইরে কোথাও পলি জমা পড়ে নদী অনাব্য হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে এই অঞ্চলই সুন্দরবনের সৌন্দর্য রক্ষা করছে।

বাংলাদেশের জলপ্রাপ্তির প্রধানতম উৎস হলো নদীবাহিত স্রোতধারা। বঙ্গোপসাগরে প্রতিদিন গড়ে ৩,৪০০ ঘন মিটার জল পড়ে। বাংলাদেশে গড়ে দৈনিক বৃষ্টিপাতে যে পরিমাণ

জল সঞ্চয় হয় এই পরিমাণ তার ৩.৯ গুণ বেশি। গঙ্গা নদী হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে প্রতি সেকেণ্ডে সর্বোচ্চ পরিমাণ জলের যোগান দেয় ৩৬,৯০০ থেকে ৬৭,৯০০ কিউবিক মিটার জল। বাহাদুরা ঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদী জল সরবরাহ করে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫,১০০ থেকে ৯১,১০০ কিউবিক মিটার। মেঘনা নদী ছাড়ে সেকেন্ডে ১৪০০০ কিউবিক মিটার। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ জল আগে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী থেকে। গঙ্গা নদীর উৎস ভারতে, ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস নেপালে ও মেঘনা নদীর উৎস ভুটানে।

সুন্দরবনে সিংহভাগ জল আসে গঙ্গা–পদ্মা থেকে গোরাই–মধুমতীর মাধ্যমে এবং মেঘনার ভাটি থেকে স্বরূপকাঠি কোচা নদীর মাধ্যমে। অবশিষ্ট জল আসে সুন্দরবনের বাইরে সৃষ্ট নদী থেকে। এই নদীগুলো হলো ভদ্রা, ভৈরব, চিত্রা, কুলপেটুয়া ইত্যাদি।

হার্ডিঞ্জ সেতুর ১৬ কিলোমিটার ভাটিতে গঙ্গা থেকে গোরাই নদীর উদ্ভব। গোরাই কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যশোহরে ঢুকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বারদিয়া অঞ্চলে গিয়েই এই বিভক্তি, এর একটি শাখা শতকরা ১৬ ভাগ জল নিয়ে হরিণঘাটার (বালেশ্বর) সঙ্গে মিশেছে মধুমতী নামে। অপর শাখা নবগঙ্গা নদী নামে বাকী শতকরা ৮৪ ভাগ জল নিয়ে মিশেছে পশুর নদীর সঙ্গে। বাংলাদেশের ১৭ কিলোমিটার উজানে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছে। এই বাঁধের দরুন বাংলাদেশে জলপ্রবাহে প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। দৈনিক ন্যূনতম প্রবাহ কমেছে শতকরা ৪৩ ভাগ এবং উচ্চতম প্রবাহে ঘাটতি শতকরা ১১২।

অপর পৃষ্ঠার ৪ক সারণিতে দুটো স্থানে মাসিক গড় জলপ্রবাহের হিসাব থেকে সুন্দরবনে জলপ্রবাহের চিত্র বিষয়ে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সুন্দরবনের পূর্বাংশের নদীগুলো কামারখালি অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমাংশের নদীগুলো ঝিকরগাছার সঙ্গে যুক্ত। পূর্বাংশের নদীসমূহ পশ্চিমাংশের নদীসমূহের তুলনায় মিঠাপানির সরবরাহ পায় বেশি। গড় মাসিক জলপ্রবাহ মার্চে প্রতি সেকেন্ডে ১৯০ ঘন মিটার থেকে আগস্টে ৭৬৫০ ঘন মিটারে দাঁড়ায়। মাথাভাঙ্গা নদীতে এপ্রিলে ১.৭ থেকে সেপ্টেম্বরে ১২৪ কিউবিক মিটার পানি থাকে। শুখা মৌসুমে অর্থাৎ মার্চে গঙ্গার শাখা গোরাই নদীতে মোট জলের ৫৭% গঙ্গা–কোবাডাক–এ ২৭% ও মাথাভাঙ্গা নদীতে ১.৬% ঘন মিটার জল থাকে। সুন্দরবনে স্থায়ীভাবে থাকে ৬২ মিলিয়ন ঘন মিটার এবং প্রবাহে থাকে ৬৫ মিলিয়ন ঘন মিটার জল।

সুন্দরবনের নদী, নদীর মোহানা ও সমুদ্রে যে সকল মাছ পাওয়া যায় তা হলো লাল দাতিনা, চিল মাছ, কইপুটি বা ছাকুন্দা, কালা হাঙ্গর বা কামোট, করাতি, চাপা, নীলাম্বরী, নায়লা, কোবাল, বোমাইট্যা, নিহারী লইট্যা, ইশিল, চন্দনা, চওকিয়া, লালপোয়া, কালা দাতিনা, সাদা মাছ, পটকা, সমুদ্র কই, চান চান্দা, পাথুয়া, তাপসী, সাদা দাতিনা, পরী,সরপুটি, চম্পা, ফাতরা, হাঙ্গর, রূপ চান্দা, গোগট, রূপা পটায়া, পার্শে, রাম পার্শে, মেনো ইত্যাদি ছাড়া আরো অনেক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। এক হিসাবে দেখা যায় এই এলাকা থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ টন ইলিশ, ১৫০ টন কোরাল, ১৫০ টন পাঙ্গাস, ১৭০ টন সাদা দাতিনা ও ৪৪৫ টন পোয়া মাছ ধরা হয়। শীতকালে দুবলার চরে হাজার হাজার লোক অস্থায়ী ঘর বাঁধে। এই মৌসুমে ওরা প্রচুর মাছ ধরে ও শুকায়। প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ মন

শুটকী তৈরি করা হয়। এ ছাড়া এখান থেকে সংগ্রহ করা হয় বছরে ৩৭৫ মেট্রিক টন কাঁকড়া, ২২৫ টন গলদা চিংড়ি ও প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন বাগদা চিংড়ির পোনা। ঝিনুক সংগৃহীত হয় ৩৬০০ মেট্রিক টন ও শামুক সংগৃহীত হয় ৩৫ মেট্রিক টন।

সারণি ৪ক : বাংলাদেশের দুটি অঞ্চলে গঙ্গার জলপ্রবাহের হিসাব (ঘন মিটারে)

মাসের নাম	স্থানের নাম ও জলের পরিমাণ (ঘন মিটারে)	
	কামারখালি	জিকরগাছা
জানুয়ারি	৩৪৩	০৬
ফেব্রুয়ারি	১৬৪	০৫
মার্চ	১০৭	০৪
এপ্রিল	১৭৭	০৪
মে	১৮১	০৪
জুন	৫২৫	০৯
জুলাই	২৬৮৪	১৬
আগস্ট	৪৪১৫	২১
সেপ্টেম্বর	৩৯৪৪	২৫
অক্টোবর	২০০৭	২২
নভেম্বর	১০২৪	১৩
ডিসেম্বর	৬২১	১৮

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' এই প্রবচনটি সম্ভবত সুন্দরবনের বিশেষত্ব থেকেই চালু হয়েছে। সুন্দরবনের স্থলজন্তুর মধ্যে সবার আগে আসে বাঘের নাম। প্রিন্স অব ওয়েলস ডিউক অব উইণ্ডসরের বাঘ শিকারের ঘটনা থেকে সম্ভবত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামটি চালু হয়েছে। বাঘ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে না। তবু জানিয়ে রাখি, সুন্দরবনে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ৩০০-৪৫০ বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্রমেই এই সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এই বাঘ লম্বায় ৩-৪মিটার ও উচ্চতায় এক মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। নদীর পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোনাজল বাঘসহ অন্যান্য মিঠাপানিতে অভ্যস্থ প্রাণীর জন্য সংকট সৃষ্টি করছে। এখানকার নদী, খালে মোহনার কুমীর *(Crocodilus porosus)* রয়েছে। পূর্বে বহু সংখ্যক কুমির ছিলো। বর্তমানে শাপলা খালে ৭-৮, ভোলা খালে ৩-৪, ভোলা নদীতে ১০-১২, হরিণথানায় ৬-৭ ও কালাপানিতে ৪-৬ টি কুমির দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কুমিরও প্রায় বিলুপ্তির পথে। এরা ৬-৮ মিটার লম্বা হয়। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১১ মিটার যা বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

সুন্দরবনের নদীতে হাঙ্গর থাকে। এদের কামোট বলা যায়। এরা নিঃশব্দে মানুষ বা অন্য প্রাণীর অঙ্গ কেটে নিয়ে যায়। এদের দাঁত এতো ধারালো যে শিকার টেরও পায় না যে তার একটি অঙ্গ কাটা পড়েছে। এরা দৈর্ঘ্যে ১০ ফুট বা তিন মিটারের বেশি পর্যন্ত হয়। এখানে

অনেক শুশুক রয়েছে। নাম গঙ্গা ডলফিন (Gangetic dolphin)। লম্বায় ১.৫–২ মিটার। বালিকাটা, অলিভ রিডলে কাঠা নামে সামুদ্রিক কচ্ছপ, চিরুনি কচ্ছপ, কাছিম ইত্যাদিও নদীতে পাওয়া যায়। অলিভ রিডলে কাঠা বর্তমানে বিলুপ্ত-প্রায়, এ ছাড়া লাল কাঁকড়া, তিন ধরনের সন্ন্যাসী কাঁকড়া তিন প্রকারের কালো কাঁকড়া, চার প্রকারের বেউলে ও চার প্রকারের গেছো কাঁকড়া দেখা যায়। নদী ও নদীর আশেপাশে দেখা যায় শঙ্খচূড়, গোখরা, শাখামুটী, চন্দ্রবোড়াও তিন পদের সামুদ্রিক সাপ। আর একটি অদ্ভুত প্রাণী হল অশ্বখুরাকৃতি বা সাগর কাঁকড়া (Horseshoe crab)। ৬০ কোটি বছর ধরে এটি পৃথিবীতে রয়েছে। এ জন্য একে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। এর দেহ লেজসহ ৪ মিটার লম্বা। বাঁচে ৫–৭ বছর। এরা কাদা খুঁড়ে পোকা ও শামুক খায়। সাঁতার জানে, তবে বেশি ঘুরে বেড়ায় না। লেজ দিয়েই মাটি খুঁড়ে। এদেরকে এখানে বেশ সংখ্যায় দেখা যায়।

বর্ষায় সুন্দরবনে পাখির হাট বসে। শামুক খোর (Openbill stork),ছোট করচে (Little egret), ধড় বক (Large egret)। পানকৌড়ি (Cormorant), লাল কাক (Purple heron),বাচকা (Night heron) ইত্যাদি পাখি বাসা বাঁধার জন্য এখানে আসে। নদীর শামুক, মাছ ইত্যাদি এদের খাদ্য। এখানে জলা জাতের পাখির মধ্যে রয়েছে শঙ্খচিল, নানা রকমের বক ও মাছরাঙা। এরা মৎস্যভোজী। ঠোঁট লম্বা, ঠোঁটের আগা একটু বাঁকানো, গলা লম্বা, পা সরু ও লম্বা। অর্থাৎ এদের শরীর এমনভাবে তৈরি যাতে মাছ শিকারে ব্যর্থ না হয়। এখানে পরিযায়ী পাখিরা আসে মূলত শীতকালে। অন্য সময়েও আসে তবে সংখ্যায় কম। উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে রয়েছে পুলিন্দা (Whimbrel), জৌরালি (Blacktailed godwit), কমন স্যান্ডপাইপার (Common sandpiper) ও আবাবিল (Comnon swallow)। স্থানীয় পাখিদের মধ্যে আছে মদন টাক, টিট্টিভ, কণ্ঠিঘুঘু, ঘুঘু, টিয়া, কুবো, বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, ফিঙে, কাবাসী, বড় কাবাসী, চশমা পাখি, শ্যামসুন্দর ইত্যাদি।

সুন্দরবনের সর্বত্র যে জন্তুটিকে দেখা যায় তা হলো চিত্রা হরিণ। বানরও রয়েছে বিস্তর। ময়ূর, বনবিড়াল, বাঘরোল, গোসাপ, অজগর ও জলের ওটার তো রয়েছে। এদের জীবন পরিক্রমাও নানাভাবে নদী-খাল প্রভাবিত।

সুন্দরবনের বাতাস, জল ও মাটি সবই লবণাক্ত। সেকারণে এখানকার গাছপালাও বিচিত্র। অধিকাংশ গাছ লবণ সহ্য করতে পারে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো এই গাছগুলো নরম কাদার উপর জন্মায়। তৃতীয়ত এ সকল গাছ প্রবল হাওয়া ও প্রচণ্ড স্রোতে অসংখ্য শিকড়ের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। জোয়ারের পানিতে গাছের গোড়া সবসময় ধুয়ে যায়, স্রোতের তোড়ে নদী-খালের পাড় ভেঙে যায়। বাতাস থেকে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প নেওয়ার জন্য এই গাছেদের শূলের মতো সুচালো শ্বাসমূল (শূলো, pneumatophore) থাকে। বাইন, কেওড়া, সুন্দরী ও পশুর গাছের শ্বাসমূল স্পষ্ট চোখে পড়ে। খলসী, তোরা, ফলো বাইন গাছে লবণ ত্যাগ করার বিশেষ গ্রন্থি থাকে। গর্জন, গেঁওয়া ও গরান গাছে রণপার মতো অসংখ্য ঠেসমূল দেখা যায়। শিকড়গুলো জলের ধাক্কা সামলাতে ও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে গাছকে সাহায্য করে। যেখানে জল ও মাটি কম লবণাক্ত সেখানে সুন্দরী, গর্জন ও কাঁকড়া গাছ ভালো

জন্মায়। বিশেষ করে যেখানে নদীর জল মিষ্টি পানি নিয়ে আসে ও বেশি পলি জমে সেখানেই সুন্দরী গাছ খুব বেশি সংখ্যায় জন্মায়। গেঁওয়া ও গরান জন্মায় বেশি লবণাক্ত অঞ্চলে। হেঁতাল জন্মায় অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে।

গর্জনের পাতা রবার গাছের পাতার মতো পুরু। ফুল ছোট ও ফল বকফুল বা সজনের ফলের মতো লম্বাটে। কাঠ লালচে-ধূসর বর্ণের। কাঠ খুব টেকসই নয়। কাঁকড়ার পাতাও গর্জনের পাতার মতো। ফুলের বৃন্তকে লাল কাঁকড়ার পায়ের মতো দেখায় বলেই এই বৃক্ষকে কাঁকড়া গাছ বলা হয়ে থাকবে। কাঠ মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। ঘরের ছাদে বীম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরীর পাতা ছোট, লবঙ্গের পাতার অনুরূপ আকারবিশিষ্ট। পাতার পৃষ্ঠভাগ মসৃণ। এর অক্ষদেশ বা নিচের অংশ ধূসর বর্ণের। ঝির ঝির মলয় হিল্লোলে আন্দোলিত পাতা দেখতে দৃষ্টিসুখকর। সুন্দরীর ফুল আকারে ছোট। বর্ণ হলুদ। সুন্দরী গাছ লম্বায় ১০–২৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বড়সড় জাম গাছের মতো। সুন্দরীর গুঁড়ির বেড় ২০–২৫ সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে। কাঠ গাঢ় লাল ও শক্ত। এর কাঠ খুবই মূল্যবান। এক সময় এই কাঠ দিয়েই এই এলাকায় নৌকা বানানো হতো। কাগজ কলে ও দিয়াশলাইয়ের কারখানায় যথাক্রমে মণ্ড ও কাঠি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে বিগত ৪/৫ দশক ধরে। এ ছাড়া জ্বালানি হিসাবে এর কদর তো আছেই। ফলে এই গাছ পূর্বের তুলনায় সংখ্যায় প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গেছে। এ ছাড়া সুন্দরী গাছের 'আগা মরা' রোগের কথাও হরহামেশা শোনা যায়। গবেষণায় জানা গেছে এ রোগের কারণ কোনো জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া নয়। মাটিতে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি হলেই নাকি গাছের আগায় পচন ধরে। আরো একটি বিষয় লক্ষ করা গেছে যে গেঁওয়া গাছের প্রাধান্য যেখানে বেশি সেখানে জন্মানো সুন্দরী গাছে এ রোগের প্রকোপ বেশি। সুন্দরী গাছের আগা পচা বা আগা মরা রোগ আশংকাজনভাবে বাড়ছে। সুন্দরী গাছহীন সুন্দরবনের কথা কি ভাবা যায়!

গেওয়া ও গরান জন্মায় সবচেয়ে লবণাক্ত জমিতে। গেওয়া খাড়া হয়ে উঠে। এর গাছ থেকে সাদা কষ বেরয়। বিষাক্ত আঠালো কষ। কাঠ হালকা। এর থেকে কয়লা ও টিকা তৈরি হয়। গাছের বড় গুড়ি দিয়ে তৈরি হয় ঢোল ও তবলা। জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ উৎকৃষ্ট। গরান ৩–৪ মিটার উঁচু হয়। এক ঝাড়ে অনেক কয়টি গাছ থাকে। কাঠ শক্ত। ঘরের খুঁটি, বেড়া ও নৌকার দাঁড় তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। গাছের ছালের ভিতরের রঙ লাল।

হেঁতাল জন্মায় একটু উঁচু জমিতে। দেখতে খেজুর গাছের মতো। এক জায়গায় অনেক হেতাল ঝাড় দেখা যায়। হেতাল দৈর্ঘ্যে ৫–৬ মিটার। লাঠি তৈরি ও ঘরের চালায় ব্যবহার করা হয়।

নূতন পলি জমে যে ভূখণ্ড জেগে উঠে তাতে গড়ে উঠে বাইনের বন। অবশ্য এতে লবণ বেশি থাকলে চলবে না। বাইন বেশ বড় গাছ, পরমায়ুও দীর্ঘ। এই গাছে ভালো তক্তা হয়। পশুরও বড় গাছ। কাঁঠালের পাতার মতো পশুরের পাতা। খুঁটি ও তক্তার জন্যে এর কদর। সুন্দরী কাঠের পরেই পশুর কাঠের চাহিদা বেশি। ধুতুল গাছ অনেকটা পশুর গাছের অনুরূপ। এই গাছের ফলের আকার বেশ বড়। কেওড়া গাছ মানুষের কাজে খুব একটা না

BANSDOC Library
Accession No. 17933

লাগলেও অন্য কারণে এর অবদান অনেক বেশি স্বীকৃত। বানর ও হরিণের প্রিয় খাদ্য হলো কেওড়ার পাতা ও ফল। নদী ও খালের ধারে কেওড়া জন্মায়। চরাঞ্চলেও কেওড়ার বন দেখা যায়। কেওড়ার ফলের স্বাদ টক। কেওড়ার ফলের চাটনী বেশ মুখরোচক। কাঠকে তক্তা হিসাবের ব্যবহার করা চলে।

হেঁতাল ছাড়া পরশ ও হোদো গাছ বাঘের আস্তানা। পরশ গাছের পাতা গোল। ফুল হলুদ রঙের। নদীর ধারে পরশ গাছের ঝোপ থাকে। ঝোপের আড়ালে থাকে বাঘ। ঝোপের ছায়ায় বসে বাঘ শিকারের জন্য ওৎ পাতে। ওড়া গাছের কাঠ নরোম। খুবই নরম। ওড়ার পাতা পচা পানিতে চিংড়ি ও অন্যান্য পোকা-মাকড় আসে। এ ছাড়া নদীর ধারে থাকে হরগোজা নামের গাছ। গাছটি কাঁটা ভর্তি। চর এলাকায় ওড়াধান গাছ ও অন্যত্র কোথাও কোথাও ঝাউ ও বনলেবু দেখা যায়। সুন্দরবনে গাব গাছেরও কমতি নেই।

সুন্দরবনের অপর এক খ্যাতি গোলপাতা গাছের জন্যে। নারকেলজাতীয় এই গাছটি দৈর্ঘ্যে খুব একটা উঁচু নয়। গাছের নাম গোলপাতা হলেও, পাতাগুলো কিন্তু দেখতে আদৌ গোলাকৃতির নয়। মাটির উপরে মূলাকৃতির কাণ্ড থেকে নারিকেল বা তাল পাতার মতো সরাসরি বেরিয়ে আসে। পাতা ডাঁটাসহ ৪-৫ মিটার লম্বা। শাখাহীন এই গাছের ফল আকারে প্রায় ফুটবলের মতো। ঘর ছাওয়া ও ঠোঙা বানানোর কাজে গোলপাতা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। ফলে এই গাছ এই কারণেই প্রায় বিনাশের পথে। এর ফল খেতে বেশ সুস্বাদু। তালের শাঁসের মতো। পাতার বোঁটা দিয়ে তীর বানানো যায়। এর পুষ্পমঞ্জরি থেকে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য নিষ্কাশন করা যায়। ফলে তা দিয়ে ভিনিগার ও মদ তৈরি করা সম্ভব হয়। গোলপাতা গাছকে কেউ কেউ হোগলাও বলে থাকেন।

১৯০৩ সালে ডেভিড প্রেন সুন্দরবন ও এর চারপাশ জরিপ করে ৩৩৪ রকমের উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান পেয়েছিলেন। সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে এক নজরে ২৫টি প্রজাতির গাছ দেখা যায়। বাংলাদেশে উদ্ভিদ, বন্যজন্তু ও পাখির কোনো জরিপ চালানো হয়েছে কিনা জানা যায়নি। ভারতীয় সুন্দরবনে এক জরিপে ৬৮টি প্রজাতির গাছের সন্ধান মিলেছে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে জীবজন্তু ও মাৎস্য মিলিয়ে সন্ধানপ্রাপ্ত মোট প্রজাতির সংখ্যা ৫০ এবং পাখি প্রজাতির সংখ্যাও প্রায় ৫০। ১৯৫৯ সালে সুন্দরবনে মোট কাঠের পরিমাণ জরিপ করা হয়েছিলো। তাতে ১৭.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার কাঠ গাছের সন্ধান মিলে। বর্তমানে এর পরিমাণ ১২.০৭ মিলিয়ন ঘন মিটার। অর্থাৎ ইতোমধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কাঠ গাছ কমে গেছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এই গরান বনের ভবিষ্যৎ কি এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ভারতীয় সুন্দরবন

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয় ১৯৪৭ সালে। ভারতবর্ষের পশ্চিমের ও পূর্বের দুটি অংশ নিয়ে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান। বাদবাকি বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয় ভারত বা ইন্ডিয়া। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব অংশের নাম পূর্ব

পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর নাম বাংলাদেশ।

ভারত বিভক্তির সময় সুন্দরবন নামের পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বা গরান বন দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর একাংশ পড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে বা বর্তমানের বাংলাদেশ রাষ্ট্রে, অপরাংশ থাকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। পৃথিবীর মানচিত্রে সুন্দরবন নামটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও আসলে এই বনটি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিস্তৃত। দুই রাষ্ট্রেই এই গরান বনের নাম সুন্দরবন।

সুন্দরবন গাঙ্গের বদ্বীপের নিম্নাংশ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অক্ষাংশ ২১°৩´ উত্তর থেকে ২২°৫´ উত্তর এবং দ্রাগিমাংশ ৮৮.৪০´ পূর্ব থেকে ৮৯°১০´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র সুন্দরবনকে তিনটি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। হুগলী নদী বরাবর জমি উঁচু কিন্তু এর পূর্বে কালিন্দী নদী পর্যন্ত জমি নিচু ও জলপ্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনায় বেশ উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা। কালিন্দী থেকে বাখেরগঞ্জ পর্যন্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার অংশে জমি উঁচু ও বাঁধগুলি প্রায় এক মিটারের মতো মাত্র উঁচু। বালেশ্বর নদীর পূর্বদিকে অর্থাৎ বাখেরগঞ্জে জমি এত উঁচু যে বাঁধের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।...বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক অতীতে (দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী) সুন্দরবন অববাহিকা ভূপৃষ্ঠের অবনমনে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে কাত হয়ে গিয়েছে (Neotechtonic change)। ফলে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে বেশি স্বাদুজল বয়ে যায় এবং ভাগীরথী হুগলী নদীতে জলের প্রবাহ কমে যায়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবনের নদীনালা কেবল সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার দ্বারা প্রভাবিত হয় ('সুন্দরবন'—রবীন্দ্রনাথ দে রচিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত)।

বনটির ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৮৩ সালে বাঘশুমারী অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ছিলো ২৬৪টি। ১৯৭৩ সালে যে সংখ্যক ছিলো তার চেয়ে শতকরা ৭.৫ হারে বেশি। বর্তমানে সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও তবে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প কেবল বিলুপ্তপ্রায় বাঘকে রক্ষা করছে না, সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমকেও (Eco-system) রক্ষা করছে। অর্থাৎ বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ গরান বনের সুন্দর পরিবেশকেও সুরক্ষা করেছে। ব্যাঘ্র প্রকল্পের ১৩৩০ কিলোমিটার কোর এলাকা (Core area) জাতীয় উদ্যান হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। জাতীয় উদ্যানটির পরিধি হলো পূর্বে হরিণভাঙা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মাতলা নদী ও উত্তরে নেতাধোপানী, চামটা, চাঁদখালি ও বাঘমারা ফরেস্ট ব্লক। সম্প্রতি ড্যামপিয়ার হজেস লাইনের দক্ষিণের পুরো ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সংরক্ষিত প্রাণমণ্ডল (Biosphere reserve) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আই.ইউ.সি.এন (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) পশ্চিমবঙ্গ স্থিত সুন্দরবন সহ সমগ্র বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড

হেরিট্যাজ-এর (World Heritage List) তালিকাভুক্ত করেছে। ফলে পৃথিবীতে সুন্দরবনের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

"সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে উত্তর-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি জোয়ার-ভাটার নদী। এগুলি কয়েকটি প্রকাণ্ড আকারের। উদাহরণস্বরূপ, মাতলা নদীর বেশ কিছু অংশ ১০ কিলোমিটারের উপর প্রশস্ত। ২৪ পরগণার সুন্দরবনে পশ্চিম থেকে পূর্বে নদী-মোহনাগুলি হলো—কুলপি থানায় হুগলী নদী থেকে উদ্ভূত চ্যানেল খাঁড়ি, কুলপি ও মথুরাপুর থানার সংযোগস্থলে সপ্তমুখী নদী, জয়নগর থানা এলাকায় ঠাকুরাণ, গোসাবা থানা এলাকায় মাতলা, গোয়াসাবা ও হরিণভাঙ্গা নদী, হিঙ্গলগঞ্জ থানায় রায়মঙ্গল নদী।

নদী মোহানাগুলির মাঝে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। ভারতীয় সুন্দরবনে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রধান দ্বীপগুলি হলো—হুগলী ও চ্যানেল খাঁড়ির মধ্যে সাগর দ্বীপ, সপ্তমুখীর পশ্চিমে ফ্রেজারগঞ্জ, সপ্তমুখী-সমুদ্রের মিলনস্থলে লোথিয়ান দ্বীপ, মাতলা নদীর মধ্যে হ্যালিডে দ্বীপ, মাতলা ও গোয়াসাবার মধ্যে ডালহৌসী দ্বীপ, এবং গোয়াসাবা ও সমুদ্রের মিলনস্থলে ভাঙাদুয়ানি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সাগরদ্বীপ সবচেয়ে বড় ও জনবসতিবহুল। দ্বীপটিতে কয়েকটি খাল ছোট ছোট অংশে ভাগ করেছে।

বড় নদীগুলির মাঝে রয়েছে বহু ছোট নদী, অগণিত খাল, নালা ও খাঁড়ি। ফলে সুন্দরবনে একটা নোনা জলের জাল সৃষ্টি হয়েছে। গড় হিসেবে এই এলাকার শতকরা ৪০ ভাগ জল, ৬০ ভাগ স্থল। সাঁড়া-সাঁড়ীর বানের সময় এই অবস্থা ঠিক উল্টে যায়। নদী-নালার মধ্যে বন, বনের মাঝে নিচু স্থানে জোয়ারে জল ওঠে, আবার ভাটার সময়ে খাঁড়ি, নালা ও খাল দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। বহু খাল দুটি নদীকে যোগ করেছে, এরকমের খালে দুদিক থেকে জোয়ারের জল আসে। এই খালগুলির স্থানীয় নাম দুআনি খাল। একটি নদী থেকে আর একটি নদীতে যাতায়াতে খালগুলিকে ভ্রমণকারীরা ব্যবহার করেন। এই প্রসঙ্গে দুর্গা দোআনি খালের উল্লেখ করা যায়। গোসাবা থেকে সজনেখালি সত্বর যাওয়ার জন্য এই খাল ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, খালটি তখনকার দিনের জমিদার রানী রাসমণি খনন করিয়েছিলেন। তবে অনেক দোআনি খালে নৌ চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে কারণ দুদিকের জোয়ারের মিলনস্থলে পলি জমে খাল মজে গিয়েছে। সর্বদা নদী নালাগুলির এক তীর ভেঙে যাচ্ছে ও অন্য তীরে পলি জমছে, ধীরে ধীরে এদের গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে। নদীর যে তীর ভেঙে যাচ্ছে সেদিক গভীর, সেজন্য লঞ্চ সেই তীর বরাবর চলে। (সুন্দরবন, রথীন্দ্রনাথ রায়)।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান হলো ক্যানিং, সাগরদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, গোসাবা, হিঙ্গলগঞ্জ, ফলতা, হাসনাবাদ ও বজবজ ক্যানিং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সদর

কার্যালয়। এটি একটি সমৃদ্ধ উপশহর। সাগরদ্বীপ একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান। এখানে মকর সংক্রান্তি তিথিতে (জানুয়ারির মাঝামাঝি) সাগর স্নান উপলক্ষে বিশাল মেলার আয়োজন হয়। প্রতি বছর এখানে পাঁচ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী ও দর্শক এই সময়ে মেলায় আসে। গোসাবা, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ ইত্যাদিও দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যটন স্থান। সম্প্রতি ভারত সরকার ফলতায় অবাধ বাণিজ্য এলাকা (Free trade zone) খুলেছেন। কলকাতার পেট্রোলজাত সামগ্রীর সরবরাহ কেন্দ্র হলো বজবজ।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীবকুল বিচারে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মধ্যে কোনো হেরফের নেই। ভারত সরকার এই বনকে রক্ষার জন্যে এবং বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্যে এবং সর্বোপরি বনের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বন ও বনাঞ্চলের অবদান

আম জাম নারিকেল সুপারী কাঁঠাল
দাড়িম্ব কমলা কলা কামরাঙা তাল
বেল লেবু আনারস আতা হরিতকী
তরমুজ কুল ফুটি লিচু আমলকী।

রামসুন্দর বসাক

৩.১ সম্পদের অফুরন্ত উৎস

ভূমিপৃষ্ঠে বনসমূহ হলো বিস্ময়ের আধার। সংগঠনের ও ঘনত্বের দিক থেকে বনসমূহ বিচিত্র। তৃণভূমি ও চারণভূমির সঙ্গে বনের অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে। ঋতুর পরিবর্তন হলে বনের নিসর্গও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেকটা খেলনা দূরবীণে নানান দৃশ্য দেখার মতো। কতিপয় বন চিরসবুজ, কতকগুলো পত্রঝরা। পত্রঝরা বনে শীতের আগমনে বৃক্ষেরা পাতা ঝরাতে শুরু করে। এটি তাদের টিকে থাকার কৌশল। পাতায় বাষ্পমোচন বেশি হয়। কিন্তু শুখা মৌসুমে মাটিতে পানির স্তর নেমে গেলে পানি সংগ্রহে টান পড়ে। তাই পাতা ঝরানো প্রয়োজন। কোনো কোনো বৃক্ষে ঝরা পাতার রঙ উজ্জ্বল হলদে বা সোনালি হলুদ। কোনো বৃক্ষে সদ্য অংকুরিত পাতার রঙ ফ্যাকাশে লাল। কখনো ঈষৎ রঙিন আভামণ্ডিত পত্রগুচ্ছ, আবার কখনো নিবিড় শ্যামল বা খয়েরি রঙের পত্রগুচ্ছ। সবই নয়নাভিরাম, দৃষ্টি সুখকর। উদ্ভিদ জীবজন্তুর মতো চলাফেরা করতে পারে না। পারে না নিজেদের জন্য আশ্রয় তৈরি করতে। ওরা পরিবর্তিত প্রতিকূল পরিবেশকেও হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ করায় সক্ষম নয়। কাজেই টিকে থাকার জন্যে বা আত্মরক্ষার জন্য গাছকে নানান উপায় অবলম্বন করতে হয়। যেমন, কোনো কোনো গাছে কাঁটা থাকে। কোনো গাছে থাকে বিষথলে। পশু-পাখি থেকে রক্ষা করার জন্যই গাছের এই ব্যবস্থা রাখতে হয়।

বন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের তেল সম্পদ বা খনিজ সম্পদ কোনো না কোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বনসম্পদ কোনো কালেই ফুরায় না যদি এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকে। তেল সম্পদ, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, বনসম্পদ সংরক্ষণে ও সৃজনে তুলনামূলকভাবে ব্যয় হয় অনেক কম। কাজেই বনকে বলা হয় নবায়নযোগ্য সম্পদের অফুরন্ত উৎস। বন ও বৃক্ষ মানুষকে কেবল বস্তুগত সম্পদ সরবরাহ করেই মানবজাতির উপকার করে না, বন ও বনাঞ্চল মানুষকে সুস্থ পরিবেশে বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবীও উপহার দেয়।

৩.২ বস্তুগত সম্পদ সরবরাহ

বন ও বনাঞ্চল থেকে মানুষ নিম্নোক্ত সম্পদের সরবরাহ পেয়ে থাকে :

১. জ্বালানি কাঠ ;

২. গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্যে কাঠ, বাঁশ, বেত, লতা ;
৩. মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য ;
৪. মাছের আহার ;
৫. শিল্পের কাঁচামাল ; এবং
৬. ভেষজ।

৩.২.১ জ্বালানি কাঠ

দেশের অধিকাংশ জ্বালানি নানা ধরনের বনাঞ্চলে সৃষ্ট কাঠের সাহায্যে মেটানো হয়। এদেশে এখনো শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ জ্বালানির জন্য কাঠের উপর নির্ভরশীল। জ্বালানি কাঠের শতকরা আশি ভাগের সরবরাহ আসে গ্রামীণ বনাঞ্চল থেকে। জ্বালানি হিসাবে কেবল কাঠ নয়, পাতা, বাকলও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৯৮৮–৮৯ সালে প্রায় ২৭.৮২ মিলিয়ন ঘনফুট, ১৯৮৯–৯০ সালে ১৩.৩১ মিলিয়ন ঘনফুট, ১৯৯০–৯১ সালে ৩৫.২৪ মিলিয়ন ঘনফুট, ১৯৯১–৯২ সালে ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট, ১৯৯২–৯৩ সালে ৬.৭ মিলিয়ন ঘনফুট ও ১৯৯৩–৯৪ সালে ৯.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ অর্থাৎ জ্বালানি কাঠ বনাঞ্চল থেকে আহৃত হয়েছে। সারণি ৫–এ বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহে মাথাপিছু জ্বালানি ও কাঠের ব্যবহার দেখানো হলো।

সারণি ৫ ঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী দেশসমূহে মাথাপিছু জ্বালানি ও কাঠ ব্যবহার

দেশ	জ্বালানি (ঘনফুট)	কাঠ (ঘনফুট)	মোট (ঘনফুট)
ভারত	৭.০৭	০.৭৬	৭.৮৩
মায়ানমার	২১.৯৭	২.৬০	২৪.৫৭
থাইল্যান্ড	৮.৮৩	৪.৫০	১৩.৩৩
নেপাল	২৪.০০	১.৪০	২৫.৪০
বাংলাদেশ	২.৭০	০.৩৪	৩.০৮

উৎস : বাইরন, ১৯৮৪ বি

৩.২.২ আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণের জন্য কাঠ বাঁশ, বেত ও লতা

চৌকি, খাট,টেবিল, চেয়ার, শোকেস, আলমারিসহ যাবতীয় আসবাবপত্রের জন্যে কাঠ, বাঁশ ও বেত ব্যবহার করা হয়। ঘর–দোরের নির্মাণসামগ্রী হিসেবেও এসবের ব্যবহার অপরিহার্য। এ ছাড়া নৌকা, বাসট্রাকের বডি, গরুর গাড়ি, রেলের স্লিপার, ইলেকট্রিক লাইনের খুঁটি, সাঁকো, লঞ্চ, লাঙল, মইসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলার সরঞ্জাম যথা ক্রিকেটের ব্যাট, খেলার টেবিল, কেরম বোর্ড ইত্যাদিতেও কাঠের ব্যবহার রয়েছে। এসব তৈরির জন্য প্রধানত মেহগনি, টিক, শাল, গজারি, গামারি, কাঁঠাল, সুন্দরী, গেওয়া, শিশু, বহেড়া, হরিতকি, জাম, গর্জন ইত্যাদি কাঠ এবং নানা প্রকারের বাঁশ ও বেত ব্যবহার করা হয়। সারণি ৬ ও ৭–এ বাংলাদেশে বিভিন্ন বনাঞ্চলে উৎপাদনশীল কাঠ ও অন্যান্য আহৃত সম্পদ দেখানো হলো।

সারণি ৬ ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে উৎপাদনকারী কাঠ

বনাঞ্চল	মোট উৎপাদন (ঘনফুট)	বছর
কাসালং	৪৫৩.১৬	১৯৮৫
রাইখং	১০৩.৬৮	১৯৮৫
কক্সবাজার	৯৫.১০	১৯৮১
চট্টগ্রাম	৮০.১২	১৯৮৫
সুন্দরবন	৩৭৫.৭০	১৯৮৫
সিলেট	১০.৫৩	১৯৮৮
শাল বনাঞ্চল	৪৫.০০	১৯৯০
বনায়ন		
উপকূলীয়	১১৩.৯৫	১৯৯০
কাসালং	৭৯.৬	১৯৮৫
রাইখং	৪৯.৫	১৯৮৫
কক্সবাজার	৮৭.০৮	১৯৮৫
চট্টগ্রাম	৬২.৭৪	১৯৮৫
সিলেট	৫১.৬৯	১৯৮৮

* এই হিসাবের মধ্যে গোরান বৃক্ষ ধরা হয়নি।

সারণি ৭ ঃ সরকারি বন থেকে কাঠ ও অন্যান্য সম্পদ সরবরাহ

ধরন	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
কাঠ ($১০^৬$ ঘনফুট)	১৯.৮০	১২.৭৬	১৪.০৭
জ্বালানি ($১০^৬$ ঘনফুট)	৩৪.৯৫	২৩.৬৬	২৬.১১
বাঁশ ($১০^৩$ খণ্ড)	৭৫.৭৭	৯২.৬২	১০৫.১০
নিপা পাম ($১০^৩$ টন)	৬২০	৭০০	৭৯০
মধু ($১০^৩$পাউন্ড)	৪৯২	৪৯২	৪৯২
মোম ($১০^৩$ পাউন্ড)	১৬৪	১৬৪	১৬৪
মাছ ($১০^৬$ পাউন্ড)	৪.৮	৪.১	৩.৭

উৎস : বনবিভাগ

৩.২.৩ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য

বনাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাণী পাতা, ফুল ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করে। মানুষও বহু রকমের শাক, লতা, পাতা, ফল ও মূল খায়। বনাঞ্চলের পশু-পাখিও পাতা, ফল, মূল খায়। বনাঞ্চলের মধু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। বাংলাদেশের উৎপাদিত মধুর বেশির ভাগই আসে বনাঞ্চল থেকে। ১৯৮৮-৮৯ সালে ১০০ মেট্রিক টন, ১৯৮৯-৯০ সালে ১৪৬ মেট্রিক টন, ৯০-৯১ সালে ২১০, ৯১-৯২ সালে ১৮২, ৯৩-৯৪ সালে ১০৭ মেট্রিক টন মধু পাওয়া গেছে বনাঞ্চল থেকে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের নদী-মোহানায় বহু রকমের মাছ। কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক ও ঝিনুক পাওয়া যায় যা মানুষের আহার্য। বনাঞ্চল থেকে আহৃত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলের মধ্যে রয়েছে জলপাই, আমলকি, বহেড়া, বেল, ঢেউয়া, উরি আম, লটকা, বেত, চালতা, কাউ, বন জামির, আমড়া, বাদাম, কাঠ বাদাম, কালো জাম, পুঁতি জাম, গোলাপ জাম, কাজু বাদাম, আংকুরা, কদম, চাঁপালিশ, বরতা, হারপাতা, লতা-কাঞ্চনা, করমচা, দাড়িম্ব, কমলা, কলা, কামড়াঙা, লিচু, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

৩.২.৪ মাছের আহার

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বা গরান বনাঞ্চলের গাছপালার বেশির ভাগ অংশই অধিকাংশ সময় পানির সংস্পর্শেই কাটায়। এখানে অসংখ্য নদী ও খাল ভূভাগ থেকে মিঠাপানি বয়ে আনে। বর্ষায় প্রায়ই নদী-খালের দুকূল ছাপিয়ে পানি বনকে প্লাবিত করে। সমুদ্রের জোয়ারের জলও ভূখণ্ডকে দুবার ধুয়ে দিয়ে যায়। আবার কিছু জল আটকাও পড়ে। গাছপালা থেকে পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড পানিতে ঝরে পড়ে। এসব পচে জৈবসারে পরিণত হয়। মাছ, শামুকসহ সকল প্রকার জলজ মাৎস্যকুল এ সকল খাদ্য আহার করে। দেখা যায় যে, সুন্দরবন অঞ্চলের চৌহদ্দির মধ্যে অধিক সংখ্যক ও অন্যান্য জলচর প্রাণী বিচরণ করে।

৩.২.৫ শিল্পের কাঁচামাল

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ উপার্জনকারী অধিকাংশ শিল্প-কারখানার উৎপাদনের জন্য দেশের বনজ সম্পদের অবাধ সরবরাহ একান্তভাবেই অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ বাজারের নানাবিধ চাহিদা মেটানোতেও নানা প্রকারের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোও অনেকাংশ বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ বিশেষ শিল্প-কারখানা হলো :

১. দিয়াশলাই ;
২. প্লাইউড ;
৩. কাগজের মণ্ড ও কাগজ ;
৪. ইট ;
৫. চুন ;
৬. নৌকা ও অন্যান্য জলযান ;
৭. লাক্ষা ;

৮. খয়ের ;
৯. শীতল পাটি ;
১০. খেজুরের গুড় ও অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদিত গুড় ;
১১. বাঁশজাত সামগ্রী ;
১২. বেতজাত সামগ্রী ;
১৩. রেশম ;
১৪. তামাক ; এবং
১৫. গ্রামীণ বন-উৎপাদিত রপ্তানীমুখী শিল্প-কারখানা।

৩.২.৫.১ দিয়াশলাই : কাঠের উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো শিল্প-কারখানার মধ্যে দিয়াশলাই কারখানা অন্যতম। বাংলাদেশে ২০টি কারখানা রয়েছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ কোটি গ্রোস (১ গ্রোস=১৪৪ বাক্স) দিয়াশলাই বাক্স উৎপাদিত হয়। কারখানাগুলোর মধ্যে ৮টি ঢাকায়, ৫টি চট্টগ্রামে আর অন্যগুলো খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, কুমিল্লা ও পটুয়াখালিতে। অধিকাংশ কারখানার অবস্থান বনাঞ্চল থেকে বেশ দূরে। ফলে এ সবের জন্য প্রায় সত্তর ভাগ কাঠ সংগ্রহ করতে হয় স্থানীয় গ্রামীণ বন থেকে।

দিয়াশলাই শিল্পে শিমূল, কদম, ছাতিম, পিটালি, জিনিয়া, দেবদারু ও চুণ্ডুল গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক কাঠ ব্যবহারের পরিমাণ ৫,৮৮,৫৬৫ টন। এর মধ্যে বাদবাকি শতকরা ত্রিশ ভাগ কাঠ সংগৃহীত হয় সুন্দরবন সংরক্ষিত এলাকার গেওয়া বৃক্ষ থেকে। উৎপাদিত পণ্যের অর্থমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২৪০ মিলিয়ন টাকা। উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যয়ের শতকরা ১৮ ভাগ ব্যয় মাত্র কাঠ সংগ্রহ খাতে।

সারণি ৮ ঃ বাংলাদেশে উৎপাদিত বাঁশ ও এর প্রকৃত চাহিদা অঞ্চলসমূহ

	বর্তমানে উৎপাদিত (এ.ডি. টন)	প্রকৃত চাহিদা (এ.ডি.টন)
১. জাতীয় বনাঞ্চলে খাঁটি বাঁশ (৯১,০৫৮ হেক্টর)	৬০০,০০০	৭০০,০০০
২. পার্বত্য অঞ্চলের উঁচু বনাঞ্চল (৬০,৭০৫ হেক্টর)	৭৫,০০০	১০০,০০০
৩. সারিবদ্ধভাবে লাগানো বাঁশ (৬০,৭০৫ হেক্টর)	৫০,০০০	১০০,০০০
৪. অশ্রেণিভুক্ত সরকারি ও খাস জমিতে উৎপাদিত বাঁশ (১২১, ৪১০ হেক্টর)	৫০,০০০	১০০,০০০
৫. চা বাগানের বনাঞ্চল (১০,১১৮ হেক্টর)	২৫,০০০	৫০,০০০
৬. গ্রামীণ বনাঞ্চল (৫৩,১৭৯ হেক্টর)	১,৭৮৪,০০০	২,০০০,০০০
সর্বমোট	২,৫৮৪,০০০	৩,০৫০,০০০

উৎস : চৌধুরী এম. আর ১৯৮৪

৩.২.৫.২. প্লাই উড

বাংলাদেশে ৯টি প্লাই উড কারখানা আছে। প্লাইউড তৈরি করা হয় চায়ের পেটিকা তৈরির জন্যে। অবশ্য অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যবহার যেমন, দরজা, পার্টিশন, কৃত্রিম ছাদ, আসবাব বানানো ইত্যাদিও রয়েছে। এই কারখানাগুলো রয়েছে চট্টগ্রামেই, যেখানে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়।

প্লাই উড তৈরিতে সিভিট, উরিয়াম, আম, পিতরাজ, হোল্ডু, কদম ও রক্তন গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বন বিভাগ থেকে কাঠ ক্রয় করা হতো। অনিয়মিত সরবরাহ সংকটের দরুন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে মোট চাহিদার শতকরা এক ভাগ কাঠ ক্রয় করে থাকে। বাকি ৯৯ শতাংশ কাঠের যোগান দেয় বাইরের কন্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ীরা। এই শিল্পে বছরে কাঠ ব্যবহারের পরিমাণ ৫ লাখ কিউবিক ফুটের চেয়েও বেশি।

সারণি ৯ ঃ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঠ, বাঁশ ও বেত

শিল্প-কারখানা	কাঁচামাল ব্যবহার ১৯৭৯-৮০	সরবরাহের পরিমাণ গ্রামীণ বন ٪	সরকারি বন ٪
১. দিয়াশলাই	৫৮,৮৫৬.৫ টন	৬৯	৩১
২. প্লাইউড	৭২৫,৪৯০ ঘনফুট	১০	৯০
৩. মণ্ড ও কাগজ	২২৭,২০০ টন	২৮	৭২
৪. ইঁট তৈরি	৭৭৩,৪৩০ টন	৭৮.৬	২১.৪
৫. চুন তৈরি	৯৩৭,৫০০ মন	১০০	নেই
৬. নৌকা নির্মাণ	২.০ থেকে ২.৫ (মিলিয়ন ঘনফুট)	৫০-৭৫	২৫-৫০
৭. লাক্ষা	৩০,০০০ (গাছ)	১০০	নেই
৮. খয়ের	২৮,০০০ মন খয়ের প্রতি বছর	১০০	নেই
৯. শীতল পাটি	২,০০০ শীতল পাটি প্রতি বৎসর	১০০	নেই
১০. খেজুরের গুড়	১০৫,০০০ টন	১০০	নেই
১১. বাঁশজাত সামগ্রী	বিভিন্ন রকমের বাঁশ	৭৫	২৫
১২. রেশম শিল্প	২,৯২০ একর তুতগাছ	১০০	নেই
১৩. বেতজাত সামগ্রী	৯০০,০০০টি	৫০-৭০	২৫-৫০
১৪. নূতন রপ্তানীমুখী শিল্প-কারখানা	বেত, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি	১০০	নেই
১৫. তামাক শুকানোর জ্বালানি	১২৮,৪৮০ টন	১০০	নেই

৩.২.৫.৩. কাগজের মণ্ড ও কাগজ : কাগজের মণ্ড ও কাগজ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে চারটি মিল রয়েছে। এগুলো পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন। অর্থাৎ এগুলো সরকারি মালিকানাধীন। মিলগুলো হলো—কর্ণফুলী পেপার মিল, চন্দ্রঘোনার রেয়ন কমপ্লেক্স ও খুলনার খালিশপুরে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল। এ সকল মিলের কাঁচামাল হলো বাঁশ ও গেওয়া গাছ। সংরক্ষিত বন থেকে সরবরাহ আসে। পাকশীর নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল ব্যবহার করে আখের ছিবড়া, গমের খড় ও পাটের বর্জ্য। সিলেটের ছাতকে অবস্থিত পাল্প ও পেপার মিল সিলেট জেলার সরকারি গ্রামীণ বন থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে। এরা পাট ও কাঠের বর্জ্য অংশও ব্যবহার করে।

কাঠ, আখের ছিবড়া, গমের খড় ও পাট বর্জ্যসহ সর্বমোট ২,২৭,২০০ টন কাঁচামাল কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সরকারি বন ও গ্রামীণ বন থেকে ২০৫,১০০ টন বাঁশ, মণ্ড তৈরির কাঠ ও গেওয়া কাঠ সংগৃহীত হয় প্রতি বছর।

৩.২.৫.৪. ইট : ইটের ভাটা বা ইট তৈরির কারখানা গড়ে উঠে নগর অঞ্চলের আশেপাশে। বিশেষ করে বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও উপজেলা কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গায়। ইট তৈরির জন্য চাই কাদামাটি ও জ্বালানি। জ্বালানির মূল উৎস হলো কাঠ ও কয়লা।

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ২২০০ ব্রিক ফিল্ড বা ইটের কারখানা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এগুলোর প্রায় অর্ধেকে ইট পোড়ানোর জন্য কাঠ ব্যবহার করা হয়। ১০০০ ইট পোড়ানো ও তৈরির জন্য ব্যয় প্রায় হাজার টাকার মতো। এতে কাঠের জন্য ব্যয় প্রায় ৫০০ টাকা।

কয়লা যে সব ভাটায় ব্যবহৃত হয় সেখানেও কয়লায় আগুন ধরানোর জন্য কাঠের প্রয়োজন হয়। এগুলোর জন্যই কেবল ৪০০০০০ টন কাঠের প্রয়োজন পড়ে। শুধু কাঠ দিয়ে পোড়ালে ১০০০ ইটের জন্য ৯১ টন কাঠ পোড়াতে হয়। কাজেই এক্ষেত্রেও প্রায় ৫০০০০০ টন কাঠের দরকার পড়ে। ইট শিল্পে তাহলে বছরে প্রায় ৯০০০০০ টন কাঠ পোড়ানো হয়। এই কাঠের শতকরা ৭০ ভাগের যোগান আসে গ্রামীণ বন থেকে।

৩.২.৫.৫. চুন : শুধু সিলেট জেলাতেই চুন শিল্প-কারখানা অবস্থিত। কারণ এখানেই কেবল এই শিল্পের জন্য কাঁচামাল লভ্য। চুনাপাথর পুড়িয়ে চুন উৎপাদিত হয়।

এখানে ২০০টি ইউনিটে চুন উৎপাদন করা হয় এবং প্রতি বছর প্রায় ৭৫০০০০ মন চুন উৎপাদিত হয়ে থাকে। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের ঘাস যা স্থানীয় গ্রামীণ বনের কাছাকাছি জায়গায় পাওয়া যায়। এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৭৯-৮০ সালে এক বছরে ৩৪৪০৩ টন জ্বালানি ব্যবহৃত হয়েছিলো।

৩.২.৫.৬. নৌকা ও অন্যান্য জলযান : বাংলাদেশে নদী, খাল ছাড়িয়ে আছে জালের মতো। বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় বহু অঞ্চল জলমগ্ন থাকে। জনগণের যাতায়াত ও মাল পরিবহণের অন্যতম উপায় হলো নৌকা।

বিভিন্ন আকৃতি ও আকারের প্রায় ৪,০০,০০০ নৌকা এই কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যাতায়াত ও মাল পরিবহণ ছাড়াও মাছ ধরা, বিনোদন ইত্যাদি কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে। কোনো নৌকা ছোট যাতে ২৫ মন ওজন বহন করা যায়। মাঝারি নৌকা বহন করে ৫০ মন ওজনের এবং বড় নৌকা এরও বেশি ওজন বহনে সক্ষম।

নৌকা তৈরির প্রধান উপকরণ হলো কাঠ। ছোট, মাঝারি ও বড় নৌকা তৈরিতে যথাক্রমে ২৫, ৪০ ও ৫০ কিউবিক কাঠের প্রয়োজন হয়। নৌকা তৈরি ও মেরামতে প্রতি বছর ২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন কিউবিক ফুট কাঠ লাগে। এর ৫০–৭০ ভাগ কাঠ ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ বন থেকে। নৌকা তৈরি ও মেরামতে আম, চাঁপালিশ, গামারি, গর্জন, জারুল, জাম, পিতরাজ, সুন্দরী, শিমূল ও টিক গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়।

৩.২.৫.৭. লাক্ষা : ক্ষুদ্র লাক্ষা নামক কীট এক ধরনের রস নিঃসরণ করে যা থেকে লাক্ষা তৈরি হয়। এই রস আঠালো ও ঘন। এই কীট কুল, পলাশ, কুসুম, শিরিষ, বাবলা ও খয়ের গাছেই কেবল বাসা বাঁধে। পোকার বৈজ্ঞানিক নাম *Lauifer lacca* Kerr. উপরিলিখিত গাছসমূহ থেকে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। প্লাস্টিক, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, চামড়া, কাঠের নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। প্রতি বছর ৩০,০০০ গাছ থেকে ৭০০০ মন লাক্ষা সংগৃহীত হয়।

৩.২.৫.৮. খয়ের : বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলাসমূহে খয়ের গাছ *(Acacia catechu)* জন্মায়। এই গাছের কাঠ খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেদ্ধ করা হয়। ফলে গাছের কষ বেরিয়ে আসে এবং ক্রমে তা ঘন তরল পদার্থের রূপ নেয়। এই পদার্থের নাম স্থানীয় ভাষায় 'লালি'। লালিকে মেশিনে চাপ দিয়ে পাটা গুড়ের আকৃতিতে তৈরি করে বাজার জাত করা হয়ে থাকে। একে কথ বা খয়ের বলে।

প্রায় ৮০০০ ইউনিটে বছরে ৫৬,০০০ মন লালি তৈরি হয়। লালি থেকে উৎপাদিত হয় ২৮,০০০ মন বাণিজ্যিক খয়ের।

৩.২.৫.৯. শীতল পাটি : শীতল পাটি মাদুরের মতোই হাতে বোনা। সরু চিলতা করে আঁশ তোলা হয় মুর্তা *(Clinogyne discholoma)* নামের গাছ থেকে। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। এর কারুকর্মীরাও নিদিষ্ট। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ না থাকলে এই পাটি বুনন করা যায় না। বছরে প্রায় ২০০০ শীতল পাটি বোনা হয়।

৩.২.৫.১০. খেজুর গুড় ও অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদিত গুড় : খেজুর গাছ কেটে রস নিষ্কাশন করা হয়। রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র খেজুর গাছ রয়েছে।

২৬,৫২০ একর এলাকায় খেজুর গাছ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এর থেকে ১৯৭০–৮০ সালে অর্থাৎ দশ বছরে ৩৮৫ ৮৮৮ টন রস নিষ্কাশন করা হয়েছিলো। সাধারণত ৮ মণ রস জ্বাল দিলে ১ মণ তরল গুড় এবং ১২ মণ রস জ্বাল দিলে ১ মণ শক্ত গুড় পাওয়া যায়। প্রতি বছর ৩৫০০০ টন তরল বা ঝোলা গুড় ও ঘন গুড় উৎপাদিত হয়। এই পরিমাণ গুড়

উৎপাদনে বছরে ১০৫০০০ টন জ্বালানি কাঠের দরকার হয়। গ্রামীণ বন থেকেই মূলত এই কাঠ সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া তাল গাছের রস থেকে তালের গুড় এবং আখ থেকে প্রচুর পরিমাণ আখের গুড় উৎপাদিত হয়। তাল গাছের রস ও আখের রস জাল দিতেও প্রচুর জ্বালানি কাঠ ব্যয় হয়।

৩.২.৫.১১. বাঁশজাত সামগ্রী : বাঁশ কেবল পল্লী নয় নগরের জন্যও খুবই দরকারী সামগ্রী। জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য।

পল্লী অঞ্চলে কৃষি যন্ত্রপাতি, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী বানানোর কাজে বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

নগরে বাঁশ দিয়ে মাদুর, ফুলদানি, তেপায়া, বাস্কেট বা ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

কাগজ, রিয়ার হুড, ছাতার বাট ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য শিল্প-কারখানায় ব্যাপক হারে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। গ্রামীণ বন মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ বাঁশ সরবরাহ করে।

৩.২.৫.১২. বেতজাত সামগ্রী : সিলেট শহরের কাছে দুটি গ্রামে বেত শিল্পের কারখানা আছে। চেয়ার, সোফা, তেপায়া, শেলফ, ঝুড়িসহ নানান তৈজসপত্র এখানে তৈরি হয়। এ কাজে বিভিন্ন প্রকারের বেত ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত গোল্লা ও জালি জাতের বেতই বেশি ব্যবহৃত হয়। অনুমান করা হয় যে, ৬০০০০০ গোল্লা বেত ও ৩০০০০০ জালি বেত প্রতি বছর এই কাজে লাগে। বেতের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় ৫ মিটার। গ্রামাঞ্চল থেকে চাহিদার সত্তর ভাগ বেত সংগৃহীত হয়।

৩.২.৫.১৩. রেশম : রাজশাহী, বগুড়া ও যশোরে ব্যক্তি মালিকানায় রেশম শিল্প-কারখানা রয়েছে। রেশম কীট পালন করা হয় তুঁত বা ভেরেণ্ডা গাছে। রেশম কীটের বৈজ্ঞানিক নাম *Bombyx mori*। কীট গাছের পাতা খায় এবং গুটি তৈরি করে। গুটি থেকে রেশম তন্তু বের করা হয়।

বর্তমানে দেশে ৪০০০ একরেরও অধিক জমিতে তুঁত গাছের চাষ হচ্ছে। প্রতি একর থেকে ১২ মন রেশম গুটি উৎপাদিত হয়।

৩.২.৫.১৪. তামাক : তামাক বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান ফসল। ১,৩৭,০০০ একরে তামাক চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন হার প্রায় ৫০,০০০ টন। এর মধ্যে মতিহারী, জাটি ও ভার্জিনিয়া জাতের তামাকই প্রধান।

২০০-৩০০ পাউন্ড শুষ্ক তামাক পাতা তৈরির জন্য প্রায় ৪০ মন (১.৬ টন) জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে ২২ মিলিয়ন পাউন্ড ভার্জিনিয়া তামাক উৎপাদনের জন্য ১২৮৪৮০ টন জ্বালানি কাঠ পোড়ানো হয়েছিলো। গ্রামাঞ্চল থেকেই এই কাঠ সংগৃহীত হয়।

৩.২.৫.১৫. গ্রামীণ বন-উৎপাদিত রপ্তানী পণ্য : বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের বিরাট চাহিদা রয়েছে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো মতে ১৯৭৮-৭৯ সালে বাংলাদেশ ৩৮.৮১ মিলিয়ন

টাকার হস্তশিল্প রপ্তানি করেছে। স্থানীয় কারুকর্মীরা কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে এগুলো তৈরি করেছেন। কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন গ্রামাঞ্চল থেকেই। সারণি ১০-এ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বনশিল্প ও তাদের আর্থিক আয়ের হিসাব দেখানো হলো।

সারণি ১০ ঃ বিভিন্ন দেশের বনশিল্প ও তাদের অর্থনীতি

	মিলিয়ন ঘন গজ এলাকার কাঠের পরিমাণ	প্রতি ঘন গজ এলাকার কাঠের মূল্য (ডলার)	প্রতি ঘন গজ এলাকায় মূল্য আরোপ (ডলার)	প্রতি ঘন গজ এলাকায় কাজ হাজার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৩৬.৩	৫৬৩.১	২২৭.১৭	৪.৬৪
ব্রিটিশ কলাম্বিয়া (কানাডা)	৯৭.৫	১৮২	৭৩.৪৭	১.৩৭
কানাডার অন্য অংশ	১১২.৮	৩৩৯.৫	১৪৪.৫	২.৮৮
নিউজিল্যান্ড	৬.৯	৭৫৫.৪২	২৩.৩	৬.৫৪
সুইডেন	৭৮.৪	৩১৭.০	১০৩.৮৯	৩.২৯

৩.২.৬. ভেষজ

আয়ুর্বেদ, ইউনানী, হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে ওষুধ উৎপাদনের মুখ্য উপকরণ হলো ভেষজ উদ্ভিদের মূল, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ। এ কাজে বর্তমানে ৭০০ উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে। ভেষজ উদ্ভিদ দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে। সে সঙ্গে বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষ কিছু ওষুধি গাছের নাম, প্রাপ্যতা, উপকরণ ও ব্যবহার সারণি ১১-এ দেওয়া হলো।

সারণি ১১ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষ কিছু ওষুধি গাছের নাম, প্রাপ্যতা, উপকরণ ও ব্যবহার

ওষুধি গাছ	প্রাপ্যতা	উপকরণ	ওষুধি ব্যবহার
বেনজোয়িন গাছ	গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এশিয়া	বেনজোয়িন	স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ও ত্বকের মৃদু সমস্যা
ব্রাজিলিয় ইপিক্যাক	ব্রাজিল	আইসোকুইনোন অ্যালকলয়েড	আমাশয়ের চিকিৎসা
কোকা	দক্ষিণ আমেরিকা	কোকেইন	নিদ্রাকারক, স্থানীয় সংজ্ঞাহারক
জ্যাবোরান্ডি	ব্রাজিল	পাইলোকারপিন	গ্লুকোমা বা চোখে চাপবৃদ্ধি ও বাত

মেক্সিকান ইয়াম	মেক্সিকো	স্টেরয়ড	জন্মনিয়ন্ত্রণে বড়ি ও আর্থ্রাইটিস
পেরেইয়া	মধ্য আমেরিকা	বেনজোয়িক এসিড	ত্বকের সমস্যা
কুইনাইন গাছ	দক্ষিণ আমেরিকা	কুইনাইন	ম্যালেরিয়া, জ্বর ও বিশেষ ধরনের হৃৎঘাত নিয়ন্ত্রণ
রাওয়েলফিয়া	গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা	রেসপেরাইন	মানসিক অসুস্থতা
রোজি পেরিউইনক্যাল	মাদাগাস্কার	৭৫টি অ্যালকলয়েড	লিউকেমিয়া ও হজকিন্‌স্ রোগ
হলুদ	গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দূরপ্রাচ্য	কারকিউমিন	রক্তের সমস্যা ও চক্ষুর সমস্যা

৩.৩ পরিবেশে বন ও বনাঞ্চলের অবদান

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জীবাশ্মঘটিত জ্বালানি তেল পুড়ে সৃষ্ট যে রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে অহরহ বিপত্তি ঘটাচ্ছে তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। সে সঙ্গে কয়লা ও কাঠ পুড়ে সৃষ্ট ধোঁয়াও তাতে নবতর মাত্রা যোগ করছে। এসব বিষবাষ্প যে নীলকণ্ঠ শুষে নিতো সেই বৃক্ষের নিধনও সমানে অব্যাহত রয়েছে এবং নিধনের তুলনায় বৃক্ষ সৃজনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে দুঃখজনকভাবে অনেক কম। জ্বালানি-সৃষ্ট (তেল, কয়লা বা কাঠ) কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের আদলে পরিবর্তন সাধন করছে। মহাকাশে তাপ ব্যাপনের দ্বারাই এই অনর্থ সৃষ্টি হচ্ছে। যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গ্রীন হাউস অ্যাফেক্ট (Green house effect) বলা হচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করতে পারে একমাত্র শ্যামলী নিসর্গ। গাছপালা এই বিষকে অমৃতে পরিণত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে এর জন্য অপরিহার্য শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিন্থেসিস বা সালোক-সংশ্লেষণ। গাছপালার বিনাশসাধনের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। সে সঙ্গে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গাছ প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করে তা বাতাসকে উপহার দেয়। যদি ইকোসিস্টেম অর্থাৎ গাছ-পালা ও জীবজন্তু এবং তাদের চারপাশের পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে তাহলে জলবায়ু সুস্থিত থাকে, মাটির স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে, জলসরবরাহ নিয়মিত থাকে, বাতাস বিশুদ্ধ থাকে ও শব্দদূষণ কম থাকে। এ ছাড়া শ্যামলী নিসর্গের নান্দনিক ও বিনোদনমূলক ভূমিকাও তো অনস্বীকার্য।

একটি বন ও তার পরিবেশের মধ্যে সর্বক্ষণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে। অতি আবশ্যকীয় পারিবেশিক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মাইক্রো-ক্লাইমেট (Micro-climate) মাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ, আর্দ্রতা বজায় থাকায় নিশ্চয়তা ও জীবজন্তু ও পতঙ্গকুলের পারস্পরিক

ক্রিয়াকাণ্ডের বিদ্যমানতা ইত্যাদি। সৌর বিকিরণ,বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বায়ুমণ্ডলের তাপ ও মাটি মাইক্রো-ক্লাইমেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি ঘন বনে তাপমাত্রার পরিসর হয় ক্ষীণ যদিও বনের বাইরের ও ভিতরের বায়ুর তাপমাত্রায় কমবেশি সমতা বজায় থাকে। তবে বনের ভিতরে আর্দ্রতার পরিমাণ থাকে বেশি। বন মাটির তাপমাত্রাকেও প্রভাবিত করে। এই তাপমাত্রা মাটির উপরের স্তরের জৈবনিক কর্মকাণ্ডেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বন বায়ুর গতিবেগকে প্রতিহত করে। এ কারণে নদী বা সাগরের উপকূলে গাছের বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়, অথবা ঝঞ্ঝা-সংকুল স্থানে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ বেষ্টনী সৃজন করা হয় যাতে বাতাসের রুদ্ররোষকে প্রশমিত করা যায়। এভাবে সে এলাকার শস্য উৎপাদন নির্বিঘ্ন করে তোলা হয়। গাছপালা ও তৃণের আচ্ছাদনহীন বিরান মাটি সহজেই বাতাসের তোড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ব্যাপক বিরান ভূখণ্ডে বনাঞ্চল সৃজিত হলে সে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে এটি একশবার সত্য যে, বনে বা বনাঞ্চলের বাইরে চারপাশের তাপমাত্রায় একটা সমতা অবস্থা সবসময় বিরাজ করে। ব্যাপক বিস্তৃত বনাঞ্চল অবশ্য বনাঞ্চলের উপরে কিছুটা মেঘ সৃষ্টি করতে পারে এবং বৃষ্টিপাত কিছু বেশি ঘটানোয় ভূমিকা রাখতে পারে। বৃষ্টি গাছের চূড়ায় পড়ে। ফলে প্রথমে এর পতন বেগের গতি রুদ্ধ হয়। গাছের উপরের দিকের পাতা ও শাখা ভিজে। কিছু কিছু বৃষ্টির পানি উবেও যায়। কিছু পরিমাণ পানি গাছের গুঁড়ি বেয়ে বনাঞ্চলের মাটিতে নেমে আসে। পাতা ও শাখার ফাঁক গলিয়ে কিছু বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতেও এসে পড়ে। যদি পুরো বনাঞ্চল ঘনভাবে সৃষ্ট গাছে ছেয়ে থাকে তাহলে বৃষ্টি সরাসরি বনের মাটিকে আঘাত করতে পারে না। এ ছাড়া বড় গাছের নিচে যদি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ও আগাছায় ঠাসা থাকে তাহলে বৃষ্টি প্রায় একেবারেই সরাসরি মাটিতে পড়তে পারে না। বনের মাটির উপরিভাগে পাতা পচে যদি হিউমাস বা জৈবসারের স্তর গঠিত হয়, তবে বৃষ্টির পানি ধীরে ধীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির উপস্তরে পৌছায়। এই পানি অনুস্রাবিত বা ফিল্টারকৃত হয়ে মাটির আরো গভীরে যায়। বর্ষা ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে নদী সারা বছর এই পানির সরবরাহ পেয়ে থাকে। মাটি পানি দিয়ে সম্পৃক্ত হবার পর, অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হতে থাকে। তবে এই প্রবাহ চলে মন্থর গতিতে। কারণ তৃণ, বীরুৎ ও পাতার আবর্জনা জল-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বালির বড় কণারাও প্রবাহের তোড়ে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

যখন কোনো ভূখণ্ডে বৃক্ষের চাঁদোয়া থাকে না, তখন বনাঞ্চলের মাটিতে জৈবসার কম থাকে। তখন বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতে আঘাত হানে এবং ভূমি ক্ষয় ঘটায়। ফলে মরুবিস্তার ঘটতে থাকে। পর্যায়ক্রমে শুকনো ও ভেজা মৌসুম চলতে থাকলে, পর্বতের বা ভূখণ্ডের ঢালু অঞ্চল মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে আরো খাড়া হতে থাকে। তদুপরি এখানে অধিক পশু চড়ানো হলো ঘাসের পরিমাণ কমে যায়, সে সঙ্গে জুম চাষের জন্য অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর উপসর্গ তো আছেই। এভাবে সংকীর্ণ উপত্যকা বা সমতলে খাঁড়ির সৃষ্টি হয়।

বৃক্ষের মূল শিলাবৎ কঠিন মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং মাটিকে আঁটসাঁট বাঁধনে ধরে রাখে। যখন মূল মরে যায় তখন মূলগুলো কৈশিক নালির ভূমিকা নেয় এবং পানিকে মাটির

গভীর স্তরে যেতে সাহায্য করে। যখন বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি ধ্বংস হয়, তখন মাটির উপরিস্তরের পাতার স্তর ও জৈবসার পানির তোড়ে ভেসে যায় এবং মাটি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে মাটির রন্ধ্রসমূহ পানিতে ভরে যায় এবং পানি চুঁইয়ে নামতে থাকে। কিন্তু চোয়ানোর পরিমাণ হয় নগণ্য। ফলে বিপুল পানির স্রোতে মাটি তো ভেসে যায়ই, সঙ্গে নুড়ি পাথর ও এমনকি বোল্ডারও ভেসে যায়। এতে মাটির নিচের শিলা বেরিয়ে পড়ে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, সিলেটের বহু পার্বত্য এলাকায় এই দৃশ্য স্পষ্ট চোখে পড়ে।

অপ্রতিহত পানির প্রবাহ নদীতে অকস্মাৎ বান ডাকে। নদীতে জলস্ফীতি ঘটে। সমতলে ভারি মাটিবাহিত জলস্রোতের কারণে নদীর দিক পরিবর্তনের আশংকা থাকে। এ রকমটি ঘটলে জনপদ বিনষ্ট হয়। শস্যহানি ঘটে। বনাঞ্চল ধ্বংস হবার জন্যে এ ধরনের খেসারত আমাদেরকে ফি বছরই দিয়ে যেতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বা শক্তি উৎপাদনের জন্য অথবা সেচের জন্য নদীতে বাঁধ দিলে এবং উজানে জলপ্রবাহে প্রচুর পলি বাহিত হলে, নদীতে তলানি জমে নদীর জলধারণের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায় এবং নদী ক্রমে গুরুত্ব হারাতে থাকে।

বনাঞ্চল প্রচুর পরিমাণ জল শোষণ করে। বৃক্ষের মূল জল পরিশোষণ করে এবং তা কোষে অভিস্রবণের মাধ্যমে পাতায় প্রেরণ করে। পাতা থেকে বাষ্পমোচন হয়। গাছের পাতায় পড়া বৃষ্টির ফোঁটাও বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফলে বাতাস বিশুদ্ধ হয়।

পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখায় বন ও বনাঞ্চলের ভূমিকাই হলো প্রধান। পরিবেশের সকল ক্ষেত্রেই এটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলো হলো :

১. বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপের সমতা রক্ষা ;
২. বন্যা ও প্লাবনরোধ ;
৩. ভূমির ক্ষয়রোধ ;
৪. ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ;
৫. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসরোধ ;
৬. বায়ু বিশুদ্ধকরণ ;
৭. শব্দদূষণরোধ ;
৮. মরুবিস্তাররোধ ;
৯. ধুলোবালি ও দুর্গন্ধ দূরীকরণ ;
১০. পশুপাখির আশ্রয় স্থল ; এবং
১১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

৩.৩.১. বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপের সমতা রক্ষা

বনের গাছপালার পাতা ও শাখা সূর্যরশ্মিকে মাটিতে পড়ায় বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বনের মাটি নরম হয় না। ঠাণ্ডা মাটির সংস্পর্শে থাকা বনের ভিতরের বাতাস বাইরের বাতাস থেকে

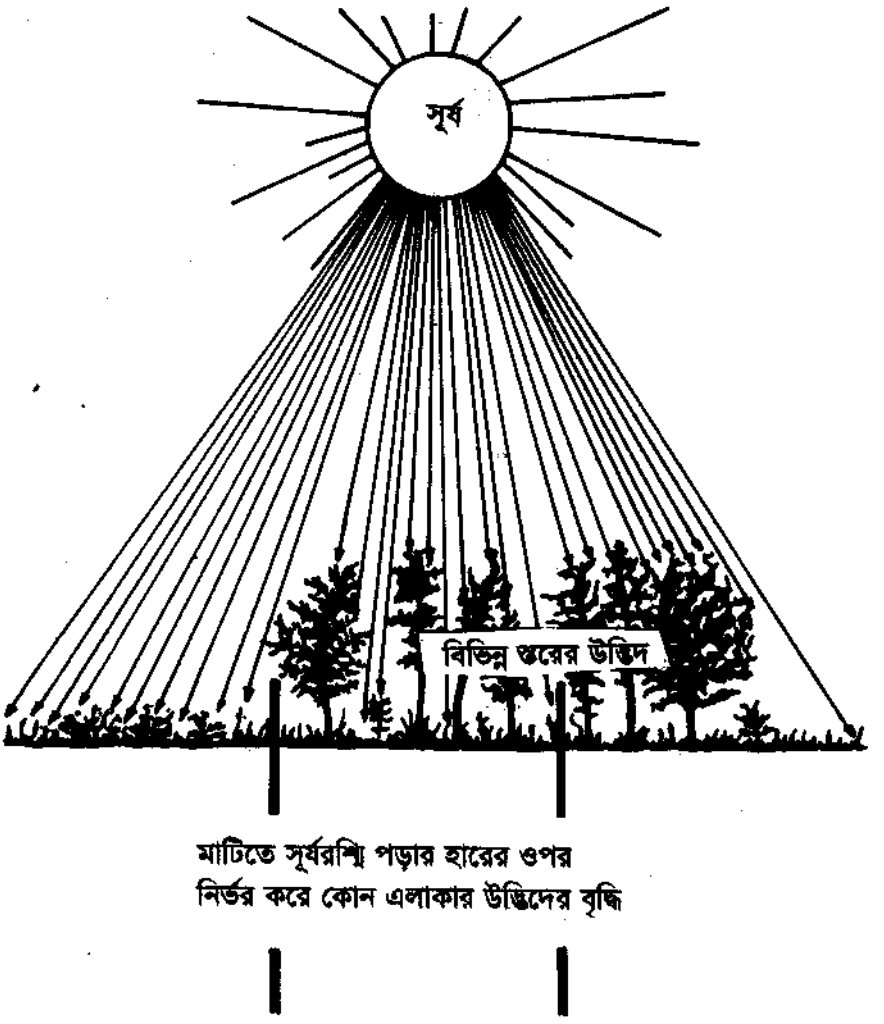

চিত্র ৬ : বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপের সমতা রক্ষা

তুলনামূলকভাবে অধিকতর শীতল থাকে। এ কারণে গ্রীষ্মে বনের ভিতরে থাকা আরামের। বন যতো ঘন হয়, বনের ভিতরের তাপমাত্রা ততো কম হয়।

এ ছাড়া গাছ প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাতাসে জলীয় বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বাতাসে তাপমাত্রা কমে আসে। গাছ মূলের সাহায্যে মাটির নিচ থেকে পানি টেনে নেয়। এই পানিই গাছ পাতার সাহায্যে বাতাসে ছাড়ে। গ্রীষ্মের কোনো গনগনে দুপুরে একটি বড়ো গাছ কম পক্ষে ১০০ গ্যালন পানি বাতাসকে উপহার দেয় এবং বাতাসের তাপমাত্রা কমানোয় প্রভূত সাহায্য করে। যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত দশটি এয়ারকুলারের পক্ষেও সম্ভব নয়।

৩.৩.২ বন্যা ও প্লাবনরোধ

ঘন বন জঙ্গল পর্বতে, পাহাড়ে বা সমতলভূমিতে বৃষ্টির জলের স্রোতপ্রবাহ বা বরফগলা জলের স্রোতকে স্থানে স্থানে ঠেকায় এবং বিনা বাধায় যেতে দেয় না। এতে স্রোতের দোর্দণ্ড প্রতাপ বা গতিবেগ কমে আসে এবং বন্যা সৃষ্টি করতে পারে না। নদী, পুকুর, রাস্তা, বাঁধ, ঘরবাড়ির আশপাশে যদি ঘন গাছের বন সৃষ্টি করা যায় তাহলে বন্যার জল হঠাৎ করে নদী–নালা ছাপিয়ে প্লাবনের রূপ নিতে পারে না।

৩.৩.৩ ভূমির ক্ষয়রোধ

গাছপালার শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। গাছপালা বা ঘাসহীন মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। মাটির ক্ষয় সম্পর্কে এক গবেষণায় দেখা যায় সাধারণ ফসলী জমি থেকে একদিনে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২২০০০/$\frac{৬}{১০}$ পাউন্ড, ঘাসে আবৃত জমি থেকে ১৮০০/$\frac{৬}{১০}$ পাউন্ড ও বনাঞ্চলে ৩৬০/$\frac{৬}{১০}$ পাউন্ড মাটি ক্ষয় হয়। পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ৪ বিলিয়ন টন অজৈব, ৪০০ মিলিয়ন টন জৈবপদার্থ মাটির গা ধুয়ে সাগরে যায়। এমনি করে ১০ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন, ৩–৫ মিলিয়ন টন ফসফরাস ও ১০০ মিলিয়ন টন পটাশিয়াম প্রতি বছর মাটি থেকে সাগরে গিয়ে মিশে।

৩.৩.৪ ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি

গাছের পাতা, ডালপালা, বাকল, শিকড় ও বৃক্ষবাসী পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের মলমূত্র ও দেহাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশে খনিজ ও জৈবসারে পরিণত হয়। এই জৈবসারের নাম হিউমাস। মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাস সরবরাহ করে। তদুপরি হিউমাস মাটির পানি ধারণের ক্ষমতা বাড়ায়। মাটির কণাসমূহের বন্ধনকে শিথিল করে। এতে মাটি ঝুরঝুরে হয়। ঝুরঝুরে মাটির ফাঁপা শূন্য স্থানে অক্সিজেন থাকতে পারে। মাটির নিচের অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী এই অক্সিজেন সেবন করে প্রাণধারণ করে। মাটির নিচের প্রাণিকুল মাটির পরম হিতকারী। কারণ এরা মাটি ওলট–পালট করে উর্বরা শক্তিতে সমতা আনে। তদুপরি প্রাণীদের দেহাবশেষ ও মলমূত্র জৈবসার হয়ে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। মাটি ক্ষয়ের দরুন মাটির

বেশি ক্ষতি হয় উর্বরা শক্তির বিনষ্টিতে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কোনো মাটির প্রায় সোয়া সেন্টিমিটার উর্বর মাটি পূরণ হতে ১০০ বছর সময় লাগে। উর্বরতা বৃদ্ধি ছাড়াও গাছগাছালির ঝরানো পাতা মাটির উপরে পুরু আস্তরণের সৃষ্টি করে। ফলে মাটি ঠাণ্ডা থাকে এবং এই আস্তরণ মাটি থেকে পানি উবে যেতে বাধা দেয়। এতেও মাটি পানি ধরে রাখার সুযোগ পায়।

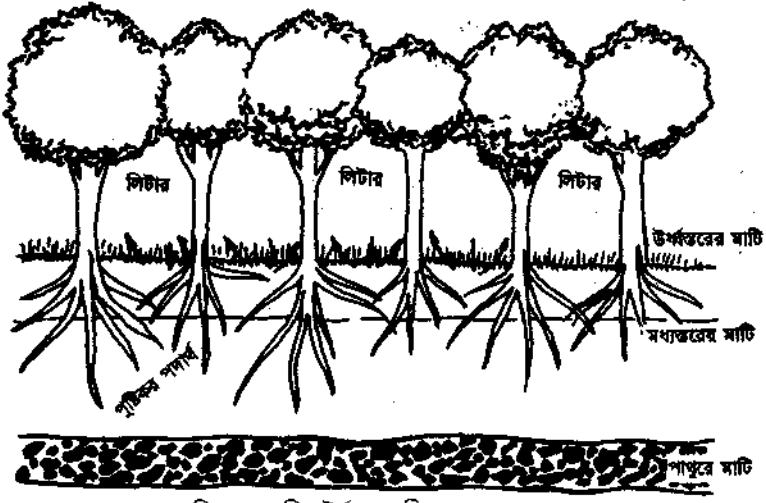

চিত্র ৭ : ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গাছের অবদান

৩.৩.৫. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসরোধ

ঘন বনাঞ্চল বা সারিবদ্ধ গাছের বেষ্টনী বাতাসের প্রবল বেগকে প্রশমিত করে। অবশ্য বনের গভীরতা, বনের সারিতে থাকা গাছের ঘনত্ব ও উচ্চতা এবং বিস্তৃতির উপর বাতাসের গতিবেগরোধের হার নির্ভর করে। দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ প্রতি মৌসুমী বায়ুতে সাধারণত যে দিক থেকে বেশি ঝড়ো বাতাস বয় সেদিকে উঁচু, ঘন, বিস্তৃত ও মজবুত গাছ রোপণ করে ও গাছ যাতে দ্রুত বাড়ে সেভাবে যত্ন নেয়। এভাবে সর্বত্র পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা বন ও গাছের সারি বাতাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুন্দরবন প্রায় সময় সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঠেকায়। সমুদ্রোপকূলে গড়ে তোলা বন-বেষ্টনী বর্তমানে সামুদ্রিক ঝড়কে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখছে।

৩.৩.৬ বায়ু বিশুদ্ধকরণ

গাছপালা বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড ও ধুলোবালি অপসারণ করে এবং বাতাসকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে। গাছ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। প্রক্রিয়া শেষে উপজাত হিসেবে সৃষ্ট অক্সিজেন বেরিয়ে আসে। গাছে প্রস্বেদন হলে সঙ্গতকারণে পাতার পৃষ্ঠদেশ ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে থাকে। ভিজা পাতায় ধুলোবালি আটকা পড়ে। এভাবে গাছপালা বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে।

৩.৩.৭. শব্দদূষণরোধ

পরীক্ষায় জানা গেছে বনবনানী শব্দের প্রখরতা বা তীক্ষ্ণতারোধেও ভূমিকা নেয়। ৩২ মিটার গভীর বন ১০ ডেসিবল শব্দ কমাতে পারে। মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বাভাবিক শব্দ হলো ৪৮ ডেসিবল এবং চলন্ত রেলের শব্দ ১০০ ডেসিবল। গাছের ঘনত্ব, অবস্থান ও বিস্তৃতি শব্দের তীব্রতার হার নিয়ন্ত্রণ করে। হাইওয়ে, রেললাইন,মিল-ফ্যাক্টরি ও বাড়ির চারপাশে ঘন বনাঞ্চল থাকলে শব্দদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৩.৩.৮. মরুবিস্তাররোধ

মাটি গাছপালার আচ্ছাদনের নিচে না থাকলে সূর্যের কিরণ সরাসরি মাটিতে এসে পড়ে। এতে মাটির পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। মাটি শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়। এরকম দীর্ঘদিন চলতে থাকলে মাটির বেশ গভীর পর্যন্ত ফাঁপা হয়ে পড়ে। বৃষ্টিতে এই মাটি ভেসে যায়, বাতাসে তা উড়ে যায়। মাটি ধীরে ধীরে উর্বরতা হারায়। এ মাটি তখন ঘাসের জন্ম দেবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। রুক্ষ বালির এই স্তূপ মরুসৃজন করে। এভাবে উত্তরবঙ্গে বৃক্ষহীন অঞ্চলসমূহে মরুময়তা দেখা দিয়েছে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এক সময় ঘন বনে আচ্ছাদিত ছিলো। মানুষ এই বন উজাড় করেছে। প্রতি বছর এই মরুভূমি ২-৩ বর্গমাইল বিস্তৃত হচ্ছে। ভারতের থর মরুভূমিও প্রতি বছর আধ মাইল করে বাড়ছে।

৩.৩.৯. ধুলোবালি ও দুর্গন্ধ দূরীকরণ

বাতাস বিশুদ্ধকরণ বিষয়ে আলোচনার সময় গাছের পাতার ধুলো ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে একটা বড়ো গাছ কেবল গ্রীষ্মেই ১০ পাউণ্ড ধূলি আটকিয়ে থাকে।

প্রতিটি গাছেই এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয় এবং তা বাতাসে মিশে। কোনো কোনো গাছের রাসায়নিক দ্রব্য খুব সুগন্ধযুক্ত। নিম, ইউক্যালিপটাস, জাম, হরিতকি, জারুল, শিরিষ ইত্যাদি গাছের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। গর্জন গাছের ক্ষীর থেকে ধূপ হয়। তদুপরি নানান বৃক্ষে ফোটা ফুলের সুবাসও বাতাসের দুর্গন্ধনাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় গাছ বাতাসের দুর্গন্ধ শুষে নেয়। এতে সেসব গাছের ক্ষতিও হয়। বিষাক্ত, সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লোরাইডস ও ওজন গ্যাস ইত্যাদিকে গাছ হজম করে মানুষকে রক্ষা করে, বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং সেসঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদেরও বাঁচায়।

৩.৩.১০ পশুপাখির আশ্রয়স্থল

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য নানা জাতের পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ প্রয়োজন। পশুপাখি, জন্তুজানোয়ার ও কীটপতঙ্গের প্রধান আশ্রয় হলো বনাঞ্চল ও গাছপালা। বনাঞ্চল ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেলে এদের ধ্বংস অনিবার্য। ফলে প্রকৃতিতে দেখা দেয় নানান বিপর্যয়। ঘন বনাঞ্চল ও যত্রতত্র গড়ে তোলা বনবনানী এই বিপর্যয় থেকে মানুষ ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে

পারে। UNDP ও FAO–এর এক জরিপে দেখা যায় শুধু সুন্দরবনে ৪ শত বাঘ, ১ লাখ ২০ হাজার হরিণ, ৪০ হাজার বানর ও ৪৩ হাজার জন্য শূকর রয়েছে। এ ছাড়া বনে ভালুক, সাপ, পাখি, কাঠবিড়ালি, গোসাপ ও কীটপতঙ্গ তো রয়েছেই।

৩.৩. ১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী, অণুজীব ও এদের দেহের জিনসমষ্টি এবং জটিল পরিবেশ জীববৈচিত্র্য গড়ে তুলে। মরুভূমি, রবফ অঞ্চল থেকে শুরু করে যে কোনো কঠিন পরিবেশেও জীবের অস্তিত্ব থাকে। তবে পৃথিবীর সর্বত্র জীবের অবস্থান সমান নয়। ফলে জীববৈচিত্র্য কোথাও কম, কোথাও বেশি। পৃথিবীর শত ভাগের ১৪ ভাগ জুড়ে রয়েছে উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য। এই চৌদ্দ ভাগেই পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলিয়ে মোট জীবকুলের অর্ধেকের বেশি বাস করে। ক্রমে বনবনানী ধ্বংস হবার কারণে পৃথিবী থেকে বহু রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বন–জঙ্গল এখানে সেখানে ধ্বংস হবার ফলে নির্দিষ্ট প্রজাতিসমূহের মধ্যে মিলিত হবার সুযোগ কমে যায় এবং পরবর্তীকালে ইপ্সিত প্রজন্ম সৃষ্টি দুষ্কর হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব না থাকলে খাদ্য শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে জীবের বা প্রাণীর বিলুপ্তির আশংকা বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাণিকুলকে রক্ষার জন্যে বন ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং বনায়ন অতি জরুরি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ

হা বৃক্ষ চিরসখা মানবের

রবীন্দ্রনাথ

বন ধ্বংসের মুখ্য কারণ জনসাধারণের ব্যাপক অংশের পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। বন প্রশাসনের নানাবিধ দুর্বলতাকেও অনেকে এর জন্য দায়ি করে থাকেন। সরকারি প্রশাসনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে এক শ্রেণির লোভী মানুষ বছরের পর বছর ধরে দেশের বনাঞ্চলকে ধ্বংস করায় নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মোট বনাঞ্চলের আট ভাগ রয়েছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে এবং অবশিষ্ট ১০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছেন জেলা প্রশাসন। ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটার উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই নিষেধ আদেশ মানা হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর থেকে বনের তত্ত্বাবধান কাজে ভাটা পড়েছে। বলতে গেলে বনাঞ্চলকে প্রায় অরক্ষিতই ধরা যায়। নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকাতে সরকার গাছ কাটার জন্য প্রতি বছর পূর্বে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে পারতো তাও পারছেন না। অথচ গাছ কাটাও বন্ধ হয়নি। ফলে গাছতো নিধন হচ্ছেই, সরকারও কোটি কোটি টাকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়াও অন্যান্য যে সকল কারণে বন ও বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে তা হলো :

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ;
২. বাঁধ, রাস্তা ও জলাধার নির্মাণ ;
৩. নদীর ভাঙন ও নদীতলের স্ফীতি ;
৪. গোচারণ ;
৫. জুমচাষ ;
৬. চিংড়িচাষ ;
৭. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ;
৮. কীটপতঙ্গের আক্রমণ ;
৯. রাসায়নিক দূষণ ও গ্রীন হাউস প্রভাব ; এবং
১০. তেলদূষণ।

৪.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের হিসেব মতে বাংলাদেশের মোট ২০ লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চলের অর্ধেকেরও কম অংশে গাছগাছড়া নেই। প্রতি বছর আট হেক্টর জমি অর্থাৎ বনভূমি ধ্বংস

হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটির বেশি। দেশ বিভাগের সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে জনসংখ্যা ছিলো এর এক তৃতীয়াংশ। লোক সংখ্যা বেড়েছে, দেশের আয়তন তো বাড়েনি। ফলে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ পড়েছে বনাঞ্চলের উপর। বন কেটে গড়ে উঠেছে মানুষের ঠাঁই, বসতভিটে। এর পর বন পরিণত হয়েছে চাষের জমিতে। নইলে আহার জুটবে কি করে! ঘরদোর নির্মাণ ও আসবাবপত্র এবং জ্বালানির জন্য কাঠের উৎসও একমাত্র এই বনাঞ্চল।

এ সমস্যা শুধু বাংলাদেশেরই নয়। সারা বিশ্ব জুড়ে যে জন বিস্ফোরণ ঘটছে, তার প্রমাণ সারণি ১২–এ দেখানো হলো, উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী জনবিস্ফোরণ বনাঞ্চল ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে স্বীকৃত। সারণি ১৩–এ পৃথিবীর কতিপয় দেশের নগরবাসীর সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণি ১২ ঃ জন বিস্ফোরণ

	জনসংখ্যা (হাজার)		জনঘনত্ব (প্রতি কি.মি.)	জন্মহার (প্রতি হাজারে)		মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)		বৃদ্ধিহার (প্রতি হাজারে)	
	১৯৫০	১৯৯২	১৯৯২	১৯৫০-৫৫	১৯৯০-৯৫	১৯৫০-৫৫	১৯৯০-৯৫	১৯৫০-৫৫	১৯৯০-৯৫
বিশ্ব	২৫১,৬১,৯০	৫,৪৭,৯০,৭৬		৩৮	২৬	২০	৯	১৮	১৭
নেপাল	৪,১,৮২	১,০৫,৭৭	১৩৬.৯০	৪৬	৩৭.৫	২৭	১৩	১৯	২৪.৫
পাকিস্তান	৩,৯৫,১৩	১২,৪৭,৭৩	১৪৩.৫৭	৫০	৪০.৬	২৯	১১	২১	২৯.৬
বাংলাদেশ	৪,১৭,৮৩	১১,৯২,২৮	৮১২.৫৩	৪৭	৩৮.৫	২৪	১৪	২৩	২৪.৫
ভারত	৩৫,৭৫,৬১	৮৭,৯৫,৪৮	২৬৫.৯৪	৪৪	২৯.২	২৫	১০	১৯	১৯.২
ভুটান	৭,৩৪	১৬,১২	৩৩.৩৫	৪৩	৪০	২৮	১৭	১৫	২৩
শ্রীলংকা	৭৬,৭৮	১,৭৬,৬৬	১৬২.২৪	৩৯	২০.৮	১২	৬	২৭	১৪.৮
চীন	৫৫,৪৭,৬০	১১৮,৭৯,৯৭	১২১.৭৪	৪৪	২০.৮	২৫	৭	১৯	১৩.৮
অস্ট্রেলিয়া	৮২,১৯	১,৭৫,৯৬	২.২৬	২৩	১৫.১	৯	৮	১৪	৭.১
জাপান	৮,৩৬,২৫	১২,৪৪,৯১	৩৩৫.৩০	২৪	১১.২	৯	৮	১৫	৩.২
জার্মানি	৬,৮৩,৭৬	৮,০২,৫৩		১৬	১১.৩	১১	১১	৫	৩.০
ফ্রান্স	৪,১৮,২৯	৫,৭১,৮২	১০৩.৯৮	২০	১৩.৫	১০	১০	৭	৩.৫
ব্রিটেন	৫,০৬,৯৬	৫,৭৬,৯৬	২৩৪.৬০	১৬	১৩.৯	১২	১২	২	১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	১৫,২২,৭১	২৫,৫১,৫৯	২৬.৯৮	২৪	১৫.৯	১০	৯	১৪	৬.৯

উৎস : United Nations Population Division

সারণি ১৩ ঃ পৃথিবীর কতিপয় দেশের নগরবাসীর সংখ্যা

	মোট জনসংখ্যার শতকরা হার		নগরবাসীর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার	
	১৯৫০	১৯৯০	৫-এর দশক	৮-এর দশক
নেপাল	০২	১১	৪.৭	৭.৬
পাকিস্তান	১৮	৩২	৪.৭	৪.৬
বাংলাদেশ	০৪	১৬	৪.৪	৬.১
ভারত	১৭	২৬	২.৭	০.৩
ভুটান	০২	০৫	৩.৪	৫.৫
মালদ্বীপ	১১	২৯	২.৪	৫.৮
শ্রীলংকা	১৪	২১	৪.৭	১.৬
চীন	১১	২৬	৮.৩	৪.৫
জাপান	৫০	৭৭	৩.৩	০.৬
জার্মানি	৭২	৮৫	১.২	০.৮
ফ্রান্স	৫৬	৭৩	০.২	০.৪
যুক্তরাজ্য	৮৪	৮৯	০.৬	০.৩
যুক্তরাষ্ট্র	৬৪	৭৫	২.৫	১.১

সৌজন্যে : "প্রকৃতি, পরিবেশ ও দূষণ"—লেখক বিশ্বজিৎ দত্ত

১৯৪৭ সালের আগে জমিদারেরা ছিলেন বনাঞ্চলের মালিক। জমিদারি প্রথা বিলোপ করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্থানীয় অধিবাসীরা বনাঞ্চলের খণ্ড খণ্ড জমি পত্তন নিয়েছে বলে জানায়। বিশেষ করে শাল প্রধান খোলা বন অঞ্চলেই এ রকমটি ঘটেছে বেশি। বনাঞ্চলে বসতবাটি নির্মাণ করার পর বসবাসকারীরা ক্রমে অল্প অল্প বনভূমি কেটে নিজেদের সীমানা বাড়িয়ে নেয়। এ ছাড়া ভুয়া কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে বনাঞ্চল গ্রাস করেছে নির্বিচারে ব্যাপকভাবে। পূর্বে বলা হয়েছে ১৯৮৭ সালের সরকারি জরিপ অনুযায়ী প্রতি বছর আট হেক্টর বনভূমি লোপাট হয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৬ সালের FAO-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, মাথা পিছু জ্বালানি কাঠ ব্যবহৃত হতো ২.৭ ঘনফুট ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো ০.৩ ঘনফুট কাঠ। যদিও কাঠ ব্যবহারের দিক থেকে পৃথিবীতে এটিই সর্বনিম্ন হার। ধারণা করা হচ্ছে ২০১০ সালে এই হার যথাক্রমে .৪৩ ঘনফুট ও .০০৮ ঘনফুটে দাঁড়াবে। তাহলে কাঠের দুষ্প্রাপ্যতার চিত্র কি পরিমাণ প্রকট তা ভাবতেও কষ্ট হয়। উত্তরাঞ্চলে জ্বালানির জন্যে কাঠের বিকল্প নেই।

অথচ এই অঞ্চলে বনভূমি রয়েছে একেবারেই কম পরিমাণে। বনায়নও বেশি হচ্ছে না। মাটির নিচে পানির স্তরও অনেক গভীরে। কাজেই পরিকল্পিত বনাঞ্চল গড়ার জন্যে যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও প্রকৌশল আবশ্যক সেদিকে খুব একটা দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। পরিণতিতে রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী এলাকায় মরুবিস্তারের লক্ষণ সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে যে পরিমাণ বৃক্ষ নিধন হয় এর শতকরা ৯৫ ভাগই ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসাবে।

নগরের আশেপাশে, নদীকে ঘিরে গড়ে উঠছে শিল্প-কলকারখানা ব্যাপকহারে। স্থাপিত হচ্ছে শিল্পনগরী। দালান-কোটা, শিল্প-কারখানা নির্মাণের জন্যে ইটের ভাটা গড়ে ওঠছে শত শত। এতে প্রচুর পরিমাণ জমি বিনষ্ট হচ্ছে। বনাঞ্চল থাকলে তাও ধ্বংস হচ্ছে।

৪.২ রাস্তা, বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ

অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বাঁধ স্থানীয় বনবনানীর বিপুল ক্ষতিসাধন করে। বাঁধের এক পাশ থাকে জলপূর্ণ ও অন্য পাশ জলশূন্য। বর্ষায় প্রায় সময় জলের চাপে বাঁধ ভাঙে বা বাঁধ ছাপিয়ে অন্য পাশে বন্যার সৃষ্টি করে। যে পাশে সারা বছর জলপূর্ণ থাকে, পানি সহ্য করায় অক্ষম বৃক্ষলতাও সে পাশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জেলার মধ্যে বা আন্তঃজেলা রাস্তা করার জন্য বনজঙ্গল নষ্ট করা হচ্ছে। পাহাড় কাটা পড়ছে। এতে বন ধ্বংস তো হচ্ছেই, বনের শান্তি ও পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। প্রাণীদের অবাধ যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে এ সকল এলাকায় জীববৈচিত্র্যও ক্রমে লোপ পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে নির্মিত কৃত্রিম জলাধার বনজঙ্গলকে তো স্থায়ীভাবে ধ্বংস করেছেই, তদুপরি সে এলাকার আবহাওয়া ও ভূমিরূপে পরিবর্তন সাধন করছে যা বর্তমানে টিকে থাকা বন ও বনাঞ্চলের উপর প্রতিক্রিয়া করছে।

৪.৩ নদীর ভাঙন ও নদীতলের স্ফীতি

নদীর ভাঙনে নদীপাড়ের গাছগাছালি, বনবনানীর স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতি আরো বড়ো ক্ষতিকে আমন্ত্রণ জানায়। বৃক্ষ, লতাপাতার শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতো। গাছপালা ধ্বংসের ফলে সহজে মাটি ক্ষয়ে নদীতে এসে পড়ে। এই মাটি নদীর তলদেশে জমে। তলদেশ স্ফীত হয়। ফলে নদী যে পরিমাণ পানি বহন করতে পারতো তা আর সম্ভব হয় না। নদীর কুল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। গ্রামগঞ্জ, বনাঞ্চল ভেসে যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী হুমকির সম্মুখীন হয় এবং অনেকগুলো মারা যায়।

৪.৪ গোচারণ

গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর জন্যে বর্তমানে চারণভূমি নেই বললেও চলে। এমনকি বর্তমানে পুকুর ও নদীর পাড়েও চাষ হয়। গবাদি পশুকে আজকাল শুষ্ক খড়, খইল, গুড় ও অন্যান্য অ-তৃণসামগ্রী খাওয়ানো হয়। এরা ছাড়া পেলে অলক্ষে বনায়নের আওতাধীন বনাঞ্চল ধ্বংস করে। বনাঞ্চলের আশেপাশের গ্রামের জনসাধারণ গরু ছাগল বনেই বিচরণ করায়। ওরা বন ধ্বংস করে। বিশেষ করে চারা গাছের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। এভাবে ক্রমে বনাঞ্চল বিরান ভূমিতে পর্যবসিত হয়।

৪.৫ জুমচাষ

পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতি ১/২ বছর পর পর তাদের আশপাশের অঞ্চলের বনজঙ্গল কেটে পুড়িয়ে জুমচাষ করে। কাঠ ও পাতা পোড়া ছাই জৈবসার হিসেবে উৎকৃষ্ট নয়। তবু সাময়িকভাবে জমিকে কিছুটা উর্বরতা দান করে। ২/১ বছর পর এই জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং ফলন দেয় যৎসামান্য। ওরা আবার অন্যত্র জুমচাষ করে। এভাবে বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধিত হয়। যেসব বনাঞ্চলে জুমচাষের ফলে গাছপালা লোপাট হয় সেখানকার মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিচে নেমে আসে। মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে যাবার দরুন সেই অঞ্চল স্থায়ী বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

৪.৬ চিংড়ি চাষ

খুলনা ও চকোরিয়া সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে বহু চিংড়ি চাষের পত্তন ঘটেছে। বনজঙ্গল কেটে চিংড়ির এসব 'ঘের' করা হয়েছে। বনাঞ্চল তো ধ্বংস হচ্ছেই, তদুপরি বনাঞ্চলের পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৪.৭ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলে প্রায়ই জলোচ্ছ্বাস হয়। এতে জনপদ ও বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্ট প্রবল ঝড়ও প্রতি বছর বহু গাছপালা ধ্বংস করে। তাপমাত্রার হঠাৎ বাড়া-কমার কারণে ঘূর্ণিঝড়েরও সৃষ্টি হয়। তাতেও অনেক এলাকার গাছপালা, ঘরদোর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

৪.৮ কীট পতঙ্গের আক্রমণ

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অলক্ষে গাছপালার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। অনেক সময় এদের আক্রমণে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যায়। কখনো কখনো ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়ে গাছপালা খেয়ে ধ্বংস করে দেয়। পঙ্গপালের আক্রমণ হলে তো বিশাল এলাকার বনজঙ্গল দারুণভাবে ক্ষতির কবলে পড়ে।

৪.৯ রাসায়নিক দূষণ

অধিক ফসল ফলানোর জন্য কৃত্রিম সার ব্যবহার করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। কৃত্রিম সার ক্রমেই জমির উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট করছে। কীটপতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিকারক জীব নষ্ট করার জন্য নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিকাংশ কীটনাশকের প্রধান উপকরণ হলো আর্সেনিক। আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ। কীটনাশকের মধ্যে অপর ভয়াবহ ক্ষতিকর উপকরণ হলো ডিডিটি। রাসায়নিক সারে ব্যবহৃত ফসফরাস, পটাশ, নাইট্রোজেন, কীটনাশকের আর্সেনিক ও ডিডিটি মাটিকে তো অনুর্বর ও বিষাক্ত করে তুলেছেই, এসব ক্ষতিকর পদার্থ পানিকেও দূষিত করেছে ও করছে। এই বিষাক্ত পানি গাছপালার মহা ক্ষতিসাধন করে। বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। এ ছাড়া গ্রীন হাউস প্রভাবের কারণেও বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

সারণি ১৪ : গ্রীন হাউজ এফেক্ট বা হরিৎগৃহ গ্যাস সৃষ্টি

	বিভিন্ন উৎস থেকে বাৎসরিক কার্বন ডাই -অক্সাইড সৃষ্টি (হাজার মেট্রিক টন)		মাথাপিছু (মেট্রিক টন)	ভূমি ব্যবহৃয় রূপবদলজনিত কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি (হাজার মেট্রিক টন)	মানুষের কর্মকাণ্ডজনিত বাৎসরিক মিথেন গ্যাস সৃষ্টি (হাজার মেট্রিক টন)
	১৯৬০	১৯৯১	১৯৯১	১৯৯১	১৯৯১
বিশ্ব		২২৬,৭২,৮৩২	৪.২১	৩৪,০০,০০০	২,৫০,০০০
নেপাল	২২	৯২৩	০.০৪	৭,৬০০	৯৮০
পাকিস্তান		৬৮,৪৪৭	০.৫৫	৯,৭০০	৩,২০০
বাংলাদেশ		১৫,৪৪৪	০.১৫	৬,৮০০	৬,২০০
ভারত	৩৩,১৯৩	৭,০৩,৫৫০	০.৮১	২১,০০০	৩৫,০০০
ভুটান		১২৮	০.০৭	৪,১০০	৩৭
শ্রীলঙ্কা	৬১৮	৪,১৬৬	০.২৬	৩,৭০০	৬০০
চীন	২,১৫,২৯৫	২৫,৪৩,৩৮০	২.২০		৪০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৪,০৬০	২,৬১,৮১৮	১৫.১০		৪,৫০০
জাপান	৬৩,৯৯৭	১০,৯১,১৪৭	৮.৭৯		৩,৬০০
জার্মানি		৯,৬৯,৬৩০	১২.৯৩		৬,৩১৪
ফ্রান্স	৭৪,৭৯১	৩,৭৪,১৩০	৬.৫৬		১,৭০০
ব্রিটেন	১,৬০,৭৭০	৫,৭৭,১৫৭	১০.০০		৩,৮০০
যুক্তরাষ্ট্র	৭,৯৯,৫৪৪	৪৯,৩১,৬৩০	১৯.৫৩	২২.০০০	২৯,০০০

উৎস : World Resource Institute.

৪.১০ তেলদূষণ

যন্ত্রচালিত নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার থেকে অহরহ পেট্রোল ও ডিজেল জাতীয় পদার্থ নদী ও সমুদ্রের পানিতে মিশছে। অনেক সময় তেলবাহী ট্যাঙ্কার ডুবে যায়। প্রায়ই সমুদ্রে তেলবাহী জাহাজ ডুবির সংবাদ পাওয়া যায়। এই তেল সমুদ্র ও নদী উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বন ও বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী

কলা রুয়ে না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

খনা

বাংলাদেশের বনাঞ্চলে কতো ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায় তার সঠিক কোনো বিবরণ জানা যায় না। এ ব্যাপারে সামগ্রিক কোনো জরিপ প্রতিবেদন নেই। নানান গবেষণা ও তথ্য থেকে মোটামুটি একটা হিসাব উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই তালিকার কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী হয়তো ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর উল্লেখ এই তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে।

৫.১ গ্রামাঞ্চলের উদ্ভিদ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণত নিম্নোক্ত উদ্ভিদসমূহ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

উদ্ভিদের বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
আম	*Mangifera indica*
ভাদি/জিয়াল	*Odinia woodier*
কাঁঠাল	*Artocarpus integrifolia*
গাব	*Diospyros* spp
মান্দার	*Erithryna indica*
পিতরাজ/রায়না	*Amoora rohituka*
জাম	*Eugenia* spp.
বড়ই	*Ziziphus jojuba*
ডুমুর, পিপুল	*Ficus* spp.
শরিফা/নোনা	*Anona* spp.
পেয়ারা	*Psidium guyava*
পিটালি	*Trewia nudiflora*
রেণ্ডি কড়ই/রেইন ট্রি	*Samarea saman*
শেওড়া	*Streblus asper*
সজনা	*Maringa* spp.

লেবু	*Citrus medica*
কড়ই	*Albizia* spp.
শিমূল	*Salmalia malabarica*
বাবলা	*Acacia nilotica*
জাম্বুরা	*Citrus decumana*

উৎস : FAO/UNDP-1981

৫.২. প্রাকৃতিক বর্ণের উদ্ভিদ

সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলসহ অন্যান্য বনাঞ্চলে প্রধান প্রধান যে সকল বৃক্ষ ও লতা পাওয়া যায় তাদের নাম হলো :

শাল, মেহগনি, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, রাবার, বহেড়া, হরিতকি, নারকেল, গর্জন, গামারি, আমলকি, তাল, খেজুর, পান, সোনালু, জারুল, কড়ই, আম, সুপারি, রেইনট্রি, শিমূল, নাগেশ্বর, জাম, চাঁপালিশ, তেলশুর, চাঁপা, সিভিট, সেগুন, কাঁঠাল, কামদেব, কনক, তুন, আমড়া, বান্দরহোলা, রাকটান ইত্যাদি পার্বত্য বনাঞ্চলে বা অন্যান্য বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। বাঁশের মধ্যে পাওয়া যায় মূলী, মিতিংগা, ভুলু ও ওরাহ। এ ছাড়া নানা প্রকার বেত পাওয়া যায় সিলেট অঞ্চলে।

সুন্দরবন অঞ্চলে সাধারণত যেসব লতা বৃক্ষ পাওয়া যায় সেসব হলো—হরগোজা, লতা হরগোজা, তোরা, খলসি, পিয়ারা বাইন, জাত বাইন, আমুর, হোদো, বকুল, কাঁকড়া গাছ, লতা-সুন্দরী, ডাকর, নটে, ঝাটি, গরান, সিংগারা, কালীলতা, গিলা, গেওয়া, দুধিলতা, সুন্দরী, ভোলা, গরিয়া, কৃপা, গোলপাতা, হেঁতাল, ধানিঘাসি, কেয়া, গর্জন, উলু, গৈরাশাক, নোনাগুড়ি, নোনাগিড়ি, জাদু পালং, কেওড়া, ওড়া, পরশ, নোনা ঝাউ, ধুন্দুল, পশুর ইত্যাদি।

৫.৩. বনাঞ্চলের প্রাণী

শচীন্দ্রলাল মিত্র "বাংলার শিকার-প্রাণী" শীর্ষক গ্রন্থে পরিশিষ্টে বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রাপ্য প্রাণীর একটি তালিকা সংযোজন করেছিলেন। গ্রন্থটি ১৯৪০ সালে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১৯৫৭ সালে। এই গ্রন্থটিকে ভারতীয় বন্যপ্রাণী সম্পর্কে বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে সবাই স্বীকার করেন। এই গ্রন্থ অনুযায়ী প্রাণীর তালিকা এরকম :

ঢাকা—বাঘ, চিতাবাঘ, সাম্বার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, শূকর, ময়ূর ও বনমোরগ।

বর্তমানে ঢাকা জেলায় বাঘ, চিতাবাঘ, সাম্বার, চিত্রা হরিণ ও ময়ূর নেই। মায়া হরিণের, অবস্থাও আশংকাজনক।

মোমেনশাহী—বাঘ, চিতাবাঘ, সাম্বার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, শূকর, গুইসাপ, হরিয়াল, নানা ধরনের হাঁস, বক ও কাদাখোঁচা।

ময়মনসিংহে কিছু মায়া হরিণ, শূকর ও বনমোরগ ছাড়া আর কোনোটির অস্তিত্ব নেই।

খুলনা—বাঘ, চিতাবাঘ, চিত্রা হরিণ, ভোঁদর, উদবিড়াল, সজারু, বনমোরগ, হরিয়াল, কুমির, গুইসাপ ও নানান জাতের সাপ।

খুলনায় চিতাবাঘ ছাড়া অন্য সব প্রাণী আছে।

ফরিদপুর—গুইসাপ ও বানর।

ফরিদপুরে গুইসাপ ও বানরের সংখ্যা বর্তমানে বেশ কম।

বাখরগঞ্জ—বাঘ, চিতাবাঘ, চিত্রা হরিণ ও শূকর।

বাখরগঞ্জ মানে বর্তমানের বৃহত্তর বরিশাল জেলা। এখানে বর্তমানে এর কোনোটি নেই।

চট্টগ্রাম—হাতি, গৌর, সাম্বার, মায়া হরিণ, শূকর, বাঘ, চিতাবাঘ, বনমোরগ, মথুরা ও বিভিন্ন জলচর পাখি।

চট্টগ্রাম বলতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বোঝানো হয়েছে। গৌর ও বাঘ চট্টগ্রাম বনাঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নোয়াখালি—বড় ধরনের প্রাণী ছিলো না।

বর্তমানে শিয়াল, বনবিড়াল, বাগডাসা ও নকুল ইত্যাদি কিছু দেখা যায়। দ্বীপাঞ্চলে প্রচুর শীতের পরিযায়ী পাখি আসে শীত মৌসুমে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম—গণ্ডার, হাতি, গৌর, সাম্বার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বাঁদিহাস ও বনমোরগ ইত্যাদি।

এখানে বর্তমানে গৌর ও গণ্ডার নেই।

রাজশাহী—গুইসাপ, রাজহাঁস ও হাঁস।

গুইসাপ সংখ্যায় অনেক কমে গেছে।

দিনাজপুর—শূকর ও চিতাবাঘ।

বর্তমানে নেই।

রংপুর—চিতাবাঘ, খরগোশ ও জলচরী পাখি।

বর্তমানে নেই।

বগুড়া—বিশেষ কোনো প্রাণীর উল্লেখ নেই। তবে শীতের পাখির উল্লেখ আছে।

পাবনা—চিতাবাঘ, শূকর ও বিভিন্ন পাখি।

বর্তমানে নেই।

বনাঞ্চলে যে সকল পাখি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধানত দেখা যায় দোয়েল, পানকৌড়ি, লাল কাক, কোঁচ বক, গোবক, ধড় বক, করচে বক, বাচকা, শামুক-খোর, মদন টাক শঙ্খচিল, টিটিভ, ছোট গুলিন্দা, জৌরালি, কাঠিঘুঘু, ঘুঘু, টিয়া, কুবো, তালবাতাসী, ফটকা, কাঠঠোকরা, আবাবিল, বাঁশপাতি, গোশালিক, ঝুটশালিক, দাঁড়কাক, কাবাসী, বড় কাবাসী, ফটিকজল, বুলবুল, চাক দোয়েল, টুনটুনি, দুগা টুনটুনি, চশমা পাখি, চড়াই, শ্যামসুন্দর, ফিঙে, মাছরাঙা, শকুন, চিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বনাঞ্চলে নানা জাতের বানর ও হনুমান রয়েছে ও সাপ রয়েছে। বানরের মধ্যে রেসাস বানরই প্রধান। সাপের মধ্যে শঙ্খচূড়, গোখরা, অজগর, ইত্যাদি প্রধান।

এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন উদ্ভিদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি সম্পর্কিত বিবরণ সারণি ১৫–এ দেখানো হলো।

সারণি ১৫ ঃ বিলুপ্ত-প্রায় বা বিপন্ন উদ্ভিদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি

	উদ্ভিদ	স্তন্যপায়ী	পাখি	সরীসৃপ	উভচর	মাছ
নেপাল	৩৩	২২	২০	৯	০	০
পাকিস্তান	১৪	১৫	২৫	৬	০	০
বাংলাদেশ	৩৩	১৫	২৭	১৪	০	০
ভারত	১৩৩৬	৩৯	৭২	১৭	৩	২
ভুটান	১৫	১৫	১০	১	০	০
মালদ্বীপ	০	১	১	০	০	০
শ্রীলংকা	২২০	৭	৮	৩	০	১২
চীন	৩৫০	৪০	৮৩	৭	১	৭
অস্ট্রেলিয়া	২০৪০	৩৮	৩৯	৯	৩	১৬
জাপান	৪১	৫	৩১	০	১	৩
জার্মানি	২৬	২	১৭	০	০	৩
ফ্রান্স	১৪৩	৬	২১	২	১	৩
ব্রিটেন	২৪	৩	২২	০	০	১
যুক্তরাষ্ট্র	২২৬২	২৭	৪৩	২৫	২২	১৬৪

উৎস : International Union for Conservation of Nature and Natural Resources-এর Red List 1990.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের বননীতি ও বিধিবিধান

কামিনী মালতী যুথী কেতকী মল্লিকা
গোলাপ টগর চাঁপা জবা শেফালিকা
গন্ধরাজ সূর্যমুখী কুন্দ কৃষ্ণচূড়া
বকুল পলাশ পদ্ম কদম্ব ধুতুরা।

রামসুন্দর বসাক

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডায়নোসর-এর কথা সকলেরই জানা আছে। সেসব বিশাল আকৃতির সরীসৃপ প্রায় ১৪ কোটি বছর এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল। তারপর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং জীবের স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ফসিল বা জীবাশ্ম নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের শেষ নেই। এই সরীসৃপ গোষ্ঠীর একটি প্রজাতি গুইসাপ, যেটি বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়। এদের দৈহিক আকৃতিতে টিকটিকি এবং সাপ-উভয়েরই দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বর্তমান যুগের গোখরো, চন্দ্রবোড়া সাপের আদিরূপ এই গুইসাপের মতোই ছিল।

একসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গুইসাপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। বর্তমানে সুন্দরবনে এবং কতিপয় বড় বনেই এদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। এই বিলুপ্তির প্রধান কারণ তাদের উজ্জ্বল মূল্যবান চামড়া। বাংলাদেশে গুইসাপ শিকারির সংখ্যা কম নয়। এখানে খোলা বাজারে বিক্রি হয় সাপ, কুমির, বনবিড়াল আর গুইসাপের চামড়া। বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণীর জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন। প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা কমছে। একসময় এ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চড়ে বেড়াতো নীলগাই। সিলেটে সোনালি বিড়াল, হাতি আর মোষ ছিল প্রচুর পরিমাণে। সেসব কবে হারিয়ে গেছে। স্বাদুজলের কুমিরও নেই। ময়ূর ও চিতাবাঘ বিলুপ্তির পথে। বহু মূল্যবান পাখি, লালনীর হাঁস আর কখনো দেখা যাবে না। চিত্রা হরিণ বিলুপ্তির পথে।

এই বিলুপ্তির জন্য প্রাকৃতিক নিয়মকে দায়ি করা যায়। তবে যে কারণটি এর জন্য বহুলাংশে দায়ি সে হলো শিকারির আদিম নেশা। কিছু সৌখিন শিকারি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন লংঘন করে বন্যপ্রাণী হত্যা করে চলেছে নির্বিচারে। এদের মধ্যে ব্যবসায়ীও আছে যারা হরিণ, সাপ, হাতি, বাঘ, কুমির, গুইসাপ ইত্যাদি হত্যা করে চলেছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। ওষুধ শিল্পে সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। আর চামড়ার বাজার তো সবসময়ই রমরমা। বন্যজন্তু হত্যা করে তাদের চামড়া দিয়ে ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট মুনাফা করছে। তাছাড়া বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার বসতি স্থাপন এবং চাষাবাদের সুবিধার্থে বন-জঙ্গল কেটে

পরিষ্কার করা হচ্ছে। মধুপুর, জামালপুর, সিলেটের ডাওকি, তামাবিলের বন-জঙ্গল কবেই কেটে সাফ করে ফেলেছে। একমাত্র অবশিষ্ট দক্ষিণের সুন্দরবন। সেখানেও শিকারিদের দৌরাত্ম্যে বন্যপ্রাণীদের জীবন অস্থির হয়ে আছে।

এসব বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তির কথা চিন্তা করেই সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন তৈরি করেছেন। এই আইনে বিশেষ কতগুলো প্রাণী হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু চোরা শিকারিরা অত্যন্ত বেপরোয়া। তাদের বন্দুকের আওয়াজে বনের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। বনাঞ্চলের এসব নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত হয় মারাত্মকভাবে। তাই বংশবৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেও তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশের সবুজ বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণীদের প্রকম্পিত করে তোলা আওয়াজ ক্রমেই ক্ষীণতর হচ্ছে। একদিন এই আওয়াজ থেমে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

এসব চিন্তা থেকে বন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয় জনগণের বিশেষ করে সরকারের টনক নড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বননীতি ও বিধিবিধান প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের বননীতি প্রণীত হয় ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৯ সালের বননীতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সমাধান ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। বননীতির লক্ষ্যসমূহ হলো :

নম্বর ১/বন-১/৭৭/৩৪৫-দেশের আবহাওয়াগত ও ভৌত অবস্থা সংরক্ষণে বনাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শনাক্ত করে এবং সুষম আর্থনীতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে;

গাছপালা মাটির ক্ষয় রোধ করে, নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বেগ প্রতিহত করে, দূষিত বায়ু ও জল বিশুদ্ধ করে এবং জীবমণ্ডলের প্রতিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করে বিধায়;

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনাঞ্চল কেবল মূল্যবান কাঠ ও জ্বালানি কাঠই উৎপাদন করে না, বনাঞ্চল মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ফল, তৈলবীজ, মশলা, তন্তু, আঠা, ভেষজ দ্রব্যসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করে বিধায়;

ব্যাপকহারে বনায়ন, বনাঞ্চলের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কৌশল, বন্যজন্তু সংরক্ষণ ও বন্যজন্তুর জন্য অভয়ারণ্য স্থাপন ও পরিচালনের কথা বিবেচনা করে;

এবং প্রত্যায়িত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের স্বার্থে বনাঞ্চলের উন্নয়ন, পরিচালন ও সংরক্ষণের জন্য একটি প্রাকৃতিক নীতি গৃহীত হওয়া উচিত বিবেচনা করে;

সরকার সদয় হয়ে, নিম্নোক্ত জাতীয় বননীতি গ্রহণ করেছেন :

ক. গুণগত উন্নয়নের জন্য দেশের সকল বনাঞ্চলকে সতর্কভাবে সংরক্ষণ ও বৈজ্ঞানিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে;

খ. সরকারী বনাঞ্চলকে জাতীয় বনাঞ্চল হিসাবে অভিহিত করা হবে এবং এসব বনাঞ্চলকে বনসৃজনের কাজেই ব্যবহার করা হবে;

গ. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গাছ লাগিয়ে বৃক্ষ ও কাঠ সম্পদ বাড়ানো হবে এবং জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য পরিমিত বনজসম্পদ আহরণ করা হবে ;

ঘ. আধুনিক প্রবণতা ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে বনসম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে ;

ঙ. বনসম্পদ নির্ভর শিল্প কারখানার জন্য জাতীয় বনাঞ্চল থেকে আবশ্যকীয় কাঁচামালের প্রয়োজন নিরূপণ করা হবে এবং নূতন নূতন বনজসম্পদ নির্ভর কলকারখানা স্থাপন করা হবে ;

চ. বন সেক্টরের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিক প্রশাসনিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বনাঞ্চলের উপর গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

ছ. বন সেক্টরের জন্য গড়ে তোলা কর্মকর্তা ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারা বন সেক্টরকে পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ;

জ. জাতীয় বননীতি চালু করার উদ্দেশ্যে এই সম্পর্কিত আইনসমূহকে যুগোপযোগী করা হবে এবং বন সেক্টরকে সরকারের স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলা হবে ;

ঝ. প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও বন্যজন্তু সংরক্ষণের এবং বনাঞ্চলের বিনোদন প্রদায়ক ভূমিকাকে ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে ; এবং

ঞ. বনাঞ্চল সম্বন্ধে উৎসাহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ও গণমাধ্যমসমূহের মাধ্যমে ব্যাপক জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং আগ্রহীদের প্রতি প্রযুক্তিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক বনায়ন

সেগুন চন্দন নিম দেবদারু শাল
বাদাম মাদার বট তেঁতুল তমাল
সুন্দরী শিমুল তাল চালিতা চম্বল
বাঁশ তুঁত ঝাউ শিশু অশ্বত্থ হিজল।

রামসুন্দর বসাক

৭.১ ভূমিকা

যে বনায়ন বা বন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে বা জনগণ সরাসরি বনসৃজন কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়। সামাজিক বন মানে—মানুষেরই বন, মানুষ সৃষ্ট বন এবং মানুষের জন্যই বন।

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বনবিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় চরাঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকার জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃতও হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নে সৃষ্ট বন বা বৃক্ষ থেকে জনগণ আর্থিক মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ পাবে স্থির আছে। এ প্রসঙ্গে কোন গাছ কি কাজে ব্যবহৃত হয়, তা নিচের সারণি ১৬-তে দেখানো হলো।

সারণি ১৬ ঃ কোন গাছ কি কাজে ব্যবহৃত হয়

১. **জ্বালানি**—আম, শিশু,জাম, ইপিল ইপিল, রেইনট্রি আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ম্যানজিয়াম, হিজল, দেবদারু, বকাইন, বাবলা, ঝাউ, পিটালি।

২. **পশুখাদ্য**—ইপিল ইপিল, কড়ই, কাঁঠাল, পাকুড়, শেওলা, যজ্ঞডুমুর, কুল, শিলভাদি, চাপালিশ, খয়ের, তুত, স্লিরিসিডিয়া, জিগনি কদম, মাদার, বর্তা, ভেরেণ্ডা, বকফুল, বট, শিমুল, গামারি, জবা, সজিনা, হলুদ।

৩. **আসবাব**—কাঁঠাল, মেহগনি, গামারি, শিলকড়ই, সেগুন, শিশু, চিকরাশি, পিতরাজ, নিম, তেলসুর, চাপালিশ,তুন।

৪. **গৃহনির্মাণ**—কাঁঠাল, জাম, মেহগিনি, কড়ই, জারুল, গর্জন, আম, সোনালু, গজারি, তেলশুর, তুন, রেইন্ট্রি, শিশু, কাঁঠাল, বাঁশ বেত, সুন্দরী, গামারি, পশুর, তাল, আমুর।

৫. **যানবাহন**—জারুল, গর্জন, বাবলা, শাল, সুন্দরী, কড়ই, গামারি, শিশু, চাপালিশ, তুন, তেলসুর, পিতরাজ, বৈলাম, জাম, খয়ের, বহেড়া, হরিতকি, দেবদারু।

৬. **ফল**—আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, পেয়ারা, তাল, কুল, খেজুর, জাম্বুরা, আতা, শরিফা, বেল, তেঁতুল, জলপাই, আমলকি, লটকন, কামরাঙা, তাল, কলা, লিচু, তরমুজ, আনারস, ফুটি, জলপাই, চালতা, দাড়িম্ব।

৭. **শিল্প**-কারখানা—গেওয়া, গামারি, বাঁশ, কদম, মালাকানা, চাঁপা, ছাতিয়ান, ইউক্যালিপটাস, বেত।

৮. **মৌমাছি পালন**—লিচু, পেয়ারা, লেবু, জাম্বুরা, জাম, বকুল, কেওড়া, খুলশী, গরান, নারকেল, সরিষা, আশফল।

৯. **কৃষি সরঞ্জাম**—বাবুল, শাল, গর্জন, ইউক্যালিপটাস, খয়ের, সুন্দরী, জাম, শিশু, কড়ই, কুল, গাব, তেঁতুল, বাঁশ, পিতরাজ, আম, লোহাকাঠ, জারুল।

১০. **কুটির শিল্প**—বাঁশ, বেত, মুর্তা, খয়ের, কদম, তুঁত, শিশু, কুল, তাল, নারকেল, খেজুর, শিমুল, বেল, গামারি।

১১. **ভূমি ক্ষয়রোধ**—বাবলা, ইপিল ইপিল,করমচা, কেওড়া, শিশু, বাঁশ, কলা, খেজুর।

১২. **মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি**—অড়হড়, বগামেডুলা, শনপাট, ইপিল ইপিল, ধইঞ্চা, শোলা, মিনজিরি, বাবলা, খয়ের, আকাশমণি, ম্যানজিয়াম, কড়ই, ঝাউ, শিশু, আমলকি, বকফুল।

১৩. **ওষুধ ও মশলা**—নিম, বহেড়া, হরিতকি, অর্জুন, অশোক, তেঁতুল, কুরচি, চিরতা, মাটি বওলা, চন্দন, ইউক্যালিপটাস, আমলকি, এলাচ, চই, তেজপাতা, দারুচিনি, বাসক, লবঙ্গ।

১৪. **তেল**—বাজনা, পিতরাজ, নারকেল, কুসুম, মহুয়া, গর্জন, শাল, ওয়েল পাম।

১৫. **দিয়াশলাই**—শিমুল, কদম, ছাতিম, পিটালি।

১৬. **বাদ্যযন্ত্র**—সেগুন, তুন, গামারি, শিশু, শিরিষ।

১৭. **কাগজ**—গেওয়া, আখ, বাঁশ, নলখাগড়া।

১৮. **প্যাকিং বাক্স**—ছাতিম, শিমুল, চাপালিশ, আমড়া, আম, তুন, চাঁপা, সিভিট, রঙ্গন, ময়না, বাঁশ।

১৯. **পেন্সিল**—তুন, নিম, সিভিট, ভুতুম।

২০. **রং**—লটকন, নীল, বোককান, জাফরান, চন্দন, কুসুম, বকম, বকুল, সুপারি, গাব, আমলকি, বহেড়া।

২১. **রাবার, গাম রজন**—রাবার, সফেদা, বুলেট, ওয়াক্সপাম, গাম বেঞ্জামন, বাবলা।

৭.২ সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

জনগণের তাৎক্ষণিক জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা পূরণ, ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সামাজিক বনায়ন অপরিহার্য। সামাজিক বনায়ন যে সকল প্রয়োজন মেটায় তা হলো :

১. গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের যোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণ ;

২. বনবিভাগের অধীন বনভূমি খুবই সীমিত। কাজেই, পতিত জমি, বসতভিটে, সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল ও নদীর পাড়, পুকুর পাড়, অফিস ও নানা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ;

৩. জ্বালানি কাঠের আশু চাহিদা পূরণে জনসাধারণকে দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান এবং গোবর ও কৃষি বর্জ্য ব্যবহারে উৎসাহ দান ;

৪. বনভূমি উদ্ধার ও দারিদ্র্য বিমোচন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলাসমূহে নিম্নমানের শালবন অধিকাংশই বেআইনী দখলে রয়েছে। এখানে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে জমি উদ্ধার করা যায় এবং এই কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে উৎপাদনশীল বনভূমি সৃজন ;

৫. পশুখাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজন ;

৬. বনের সুফল ভোগ করার স্বার্থে বনায়ন (দুর্গম এলাকায় অবস্থিত বন মানুষের বিশেষ কাজে আসে না) ;

৭. ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পানিতে জৈবসার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমির আলে বনায়ন ;

৮. ২৭০০০০ হেক্টর অনাবাদী ও প্রান্তিক জমিতে বনায়ন ;

৯. বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্যে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ;

১০. বনায়নকে সফল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নার্সারী স্থাপনে প্রেরণা দান (এতে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে) ;

১১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণরোধ ও মরুবিস্তার রোধ করা ;

১২. ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমিতে উৎপাদনমুখী ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ;

১৩. ১৮০০০০ কিলোমিটার রাস্তা ও ৬০০০ কিলোমিটার বাঁধে বনায়ন ;

১৪. ৩০,৪০০ হেক্টর বসতভিটেয় বৃক্ষরোপণ ;

১৫. পতিত চা বাগান ও সরকারি খাস জমিতে বনায়ন ;

১৬. ৫৮,০৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ;

১৭. ১,৬৩,০০০ গ্রামীণ পুকুর পাড়ে ৪০,৪০০০ একর পতিত জমিতে বনায়ন ; এবং

১৮. ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রশস্ত রাস্তা, মসজিদ-মন্দির-মঠ ও গীর্জার প্রাঙ্গণ, গোরস্থান, কবরস্থান, শ্মশান, উদ্যান, শিল্প-কারখানা এলাকা ও গোচারণ ভূমিতে বন সৃজন।

৭.৩. সামাজিক বনায়নের প্রকারভেদ

সামাজিক বনায়ন সাত প্রকার।

১. কম্যুনিটি বনায়ন ;
২. গ্রামীণ বনায়ন ;
৩. অংশীদারিত্ব বনায়ন ;
৪. স্বনির্ভর বনায়ন বা নগর বনায়ন ;
৫. কৃষি-সম্পৃক্ত বনায়ন ;
৬. বাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন ; এবং
৭. অবাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন।

৭.৩.১. কম্যুনিটি বনায়ন

জনগণ বা কম্যুনিটির অধীন জমিতে জনগণেরই লাভের জন্য যে বন গড়ে তোলা হয় একে কম্যুনিটি বনায়ন বলা হয়। এই বন থেকে লভ্য অর্থ স্থানীয় সকল জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। ভূমিহীন কৃষককে এই বনায়নে অংশ গ্রহণ করায় উৎসাহিত করা যায়। কারণ জমির মালিককে উৎপাদনের অংশ দিতে হয় না। জনগণই পুরোটা ভোগের অধিকার পায়। মসজিদ, মন্দির, মঠ, গির্জা, কবরস্থান, শ্মশান, গোচারণভূমি ও সরকারের খাস জমিতে কম্যুনিটি বন সৃজিত হতে পারে।

৭.৩.২. গ্রামীণ বনায়ন

এই বনায়ন কাজ সফল করতে হলে যেখানে সম্ভব সেখানে সরকারকে জমি বরাদ্দ করতে হবে। কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে জমিতে চাষাবাদ করবে। সে সঙ্গে গাছও লাগাবে। এই শর্তেই অর্থাৎ গাছ লাগানোর শর্তেই জমির বরাদ্দ প্রদত্ত হবে। ফলে,

ক. স্বল্পব্যয়ে গাছপালা সৃজন সম্ভব ;
খ. বেকারের জন্য কর্মসংস্থান হবে ;
গ. পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে ;
ঘ. আপসে বনের আগাছা, লতাপাতা পরিষ্কার হয়ে যাবে ; এবং
ঙ. সহজে পশুখাদ্য ও জ্বালানি কাঠের সংস্থান হবে।

বনে উৎপাদিত গাছের পুরো লাভ কৃষকরাই ভোগ করবে। এই বরাদ্দ দেওয়া হবে পাঁচ বছর মেয়াদি। পরে এই কৃষকদের অন্যত্র জমি বরাদ্দ করা হবে। এভাবে এখানে অস্থায়ী বনের সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

স্থায়ী বনায়ন লক্ষ্যে সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জমি বরাদ্দ করবেন। সরকারের মূল লক্ষ্য থাকবে স্থায়ী বন গড়ে তোলা। সে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষককে বৃক্ষ উৎপাদকে পরিণত হতে সুযোগ দেওয়া। সরকার এদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্বাস দেবেন এবং সে লক্ষ্যেই

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সরকার বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক অনুদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করবেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্যই হলো কৃষক যাতে ক্রমে জমিচাষের পাশাপাশি মূল্যবান বৃক্ষসম্পদ গড়ে তোলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সরকার যেহেতু জমির বরাদ্দ চিরস্থায়ী করবেন সেহেতু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের অবকাশ থাকবে না।

৭.৩.৩. অংশীদারিত্ব বনায়ন

এই কর্মসূচি মূলত পার্বত্য এলাকার জনগণের জন্যে গৃহীত হয়। বিশেষ করে জুমচাষীদের জন্যে। যারা কিছুদিন পর পর চাষের স্থান পরিবর্তন করে। জুমচাষে বনাঞ্চলের কি ক্ষতি হয় তা আগে আলোচনা করা হয়েছে। অংশীদারিত্ব বনায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবারকে বনায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূমি বরাদ্দ করা হয়। তারা এখানে গাছ লাগাবে এবং এই গাছ প্রাপ্তবয়স্ক হলে তা নিজেরা ব্যবহার করবে বা বিক্রি করে লভ্যাংশ পাবে। তাদেরকে বিনা মূল্যে গাছের চারা সরবরাহ করা হবে এবং ঘেরা দেওয়া, পরিচর্যা করা, সার প্রদানের জন্যে অর্থের যোগান দেওয়া হবে। চুক্তি অনুযায়ী কৃষক ও সরকার উৎপাদিত পণ্যের অর্থ বন্টন করে নেবেন। সড়ক, মহাসড়ক, রেলসড়কের পাশের জমিতেও এই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

৭.৩.৪. নগর বনায়ন বা স্বনির্ভর বনায়ন

নগর বা মহানগরে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে, প্রাণভরে বিশুদ্ধ সুবাতাস পেতে হলে এখানে বনসৃজন অতি জরুরি। বাংলাদেশের মহানগর ঢাকায় এক সময় প্রায় সব জায়গায় শ্যামলী নিসর্গে ভরপুর ছিলো। সেই মহানগরে আজকাল বৃক্ষের সংখ্যা এতোই কমে গেছে যে একে রুক্ষ নগরী মনে হয়। নূতন এলাকায় গড়ে ওঠা শহরের অবস্থা আরো করুণ। ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য নগরের অবস্থাও তাই। অট্টালিকার পর অট্টালিকায় সর্বত্র ছেয়ে গেছে। যেটুকু ফাঁকা তাতে বৃক্ষরোপণের সুবিধে নেই। রোপণ করা হলেও তা বৃদ্ধির উপায় নেই। অট্টালিকা ওসব গাছে সূর্যের রশ্মি পড়ায় বাধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে মাটির নিচে শিকড়ের অগ্রগমনেও তা প্রতিবন্ধক হয়।

নগর, মহানগর থেকে কেবল বৃক্ষই লোপাট হয়নি, ছোট-বড় জলাশয়গুলোও বিলীন করা হয়েছে। ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধির সুযোগও বিশেষ নেই। নগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস প্রাঙ্গণ, বাড়ির আঙিনার অব্যবহৃত জমি, সড়কের পাশের জমি, ট্রাফিক পয়েন্ট ও পাকা বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণ করা অতি আবশ্যকীয় কর্মসূচি হওয়া এ মুহূর্তের দাবি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

তবে নগরে সাধারণত দৃষ্টিনন্দন, বাহারি গাছ ও সুবাস ছড়ায় এমন গাছ লাগানোর ঝোঁক বেশি হওয়াই সঙ্গত। হোক না বাহারি গাছ তাতেও অনেকটা কাজ হবে। ফ্যাক্টরি ও মোটর ইঞ্জিন নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইডকে গাছ টেনে নিয়ে অক্সিজেন উপহার দেবে। পাতা কাণ্ড ধুলোবালি আটকাবে। বাতাস বিশুদ্ধ হবে।

তবে এই বনায়ন সৃজনে মুখ্যত নগরের অট্টালিকার মালিক বা ভাড়াটেদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে সরকারের ভূমিকা গৌণ। সরকারের এখন থেকে বাড়ির প্ল্যান পাশ করার সময় বা হাউজিংয়ের আদেশ দেবার সময় বনায়নের আবশ্যকীয় শর্ত আরোপ করতে পারেন।

নগরের পার্কগুলোতে পরিকল্পিতভাবে উদ্ভিদ লাগানো, পরিচর্যা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা জরুরি। এতে নগরবাসী বিনোদনের সুযোগ পাবে এবং নানান উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে নগরে নবপ্রজন্মের শিশু-কিশোররা এতে উপকৃত হবে। বৃক্ষ সবুজ বেষ্টনী হিসেবে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ তো করবেই সেসঙ্গে কলকারখানা ও যানবাহনের রাসায়নিক ধোঁয়ায় দূষিত বায়ুকে দূষণমুক্ত করবে।

নগরে ও নগরের আশেপাশে স্থিত কলকারখানায় বাধ্যতামূলকভাবে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার নির্দেশ দিতে হবে। এতে নগরবাসী কলকারখানাজাত শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণের করাল গ্রাস থেকে রেহাই পাবে। এ সকল বৃক্ষ পাখি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিগণিত হবে। অবশেষে এই বৃক্ষ থেকে পাওয়া যাবে মূল্যবান কাঠ, জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য ও ফুল-ফল।

৭.৩.৫. কৃষি-সম্পৃক্ত বনায়ন

বহু শত বছর ধরে খামার উন্নয়ন ও বন উন্নয়ন আলাদাভাবে হয়ে আসছিলো। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে কৃষিভূমিতে বনসৃজনের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। কৃষি-সম্পৃক্ত বনায়নে একজন কৃষক একই সঙ্গে শস্যদায়ী উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্ভিদ চাষ করতে পারেন।

কৃষক একই জমির কিছু অংশে শস্যদায়ী উদ্ভিদ ও কিছু অংশে অন্যান্য উদ্ভিদের বন সৃজন করবেন। অথবা জলাজমির ধারে বা জলাজমিতে বন সৃষ্টির উদ্যোগ নেবেন। কৃষক জমিতে আলের মতো সার করে বৃক্ষরোপণ করে, সারির মধ্যে বর্ষজীবী শস্য ফলাতে পারেন। বৃক্ষের সারি যতোদিন না শস্যের জন্য আলো, ছায়া ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ততোদিন সেগুলোকে না কেটে রেখে দিলে তাতে পশুখাদ্য ও জ্বালানি কাঠের সংস্থান হবে। কোনো কোনো উদ্ভিদের ফলও খাদ্য হিসেবে কাজে আসতে পারে। শুখা মৌসুমে জমি শস্য দেয় না, কিন্তু লাগানো বৃক্ষ পরোক্ষে অর্থের সংস্থান করে এবং জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়। শুখা মৌসুমে কৃষক বেকার। তখন এ সকল গাছের পরিচর্যায় কৃষক সময় ব্যয় করতে পারেন।বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ এ ধরনের বনায়নের চমৎকার সাফল্য ভোগ করছে। বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির আয়োজন নিলে তাঁরা সহজেই উদ্বুদ্ধ হবেন। এ জন্যে সরকার ও বেসরকারি সংস্থানসমূহের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এটি করা সম্ভব হলে বছরের বেশির ভাগ সময়, অধিকাংশ জমি বিরান পড়ে থাকবে না। খাঁ খাঁ রোদে মাটি শুকিয়ে জমিতে ফাটল সৃষ্টি হবে না। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গ বাসা বাঁধবে। গাছের পাতা ও পাখি-পতঙ্গের বিষ্ঠা ও অন্যান্য বর্জ্য জৈবসারের যোগান দেবে।

মাটিতে বাসকারী প্রাণিকূল গাছের ছায়ায়, ভেজা মাটিতে নিরাপদ জীবনের আশ্রয় পাবে। গাছে বসা পাখি ও পতঙ্গ ফসলের কিছু ক্ষতি করলেও আখেরে কৃষকের মুনাফাই হবে বেশি।

৭.৩.৬. বাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন

সমৃদ্ধ কৃষক বা ধনী কৃষককে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে যাঁরা উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রি করেন তাঁদেরকে এ ধরনের বনায়নের পরামর্শ দেওয়া যায়। এতে পরিবেশ যেমন সুরক্ষা পায়, তেমনি কৃষকও অনেক বেশি লাভবান হবেন। এক্ষেত্রে কৃষক তাঁর উদ্বৃত্ত জমিতে শস্য বোনা বাদ দিয়ে এমন উদ্ভিদ লাগাবেন যা ভবিষ্যতে মূল্যবান কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অথবা এমন উদ্ভিদ লাগাবেন যা শিল্প-কারখানার উপকরণ হিসেবে কাজে আসবে। যেমন কাগজের মণ্ড, দেশলাইয়ের কাঠি তৈরিতে যে সব কাঠ ব্যবহৃত হয় সেসবের সংস্থানের জন্য উদ্ভিদ লাগাতে পারেন। আসবাবপত্র ও জ্বালানি কাঠের জন্য বাংলাদেশে উদ্ভিদের চাহিদা তো সবসময়ের জন্য তো রয়েছেই। এ ছাড়া ফলদায়ী বৃক্ষও অর্থাগমের পথ সুগম করবে। তবে এক্ষেত্রে কৃষক স্বউদ্যোগে চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেবেন। অবশ্য উদ্বৃত্ত চারা বিক্রি থেকেও তারা লাভবান হবেন।

৭.৩.৭. অবাণিজ্যিকভাবে খামার বনায়ন

এক্ষেত্রে কৃষক তাঁর নিজ জমিতে শস্যের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ করবেন। এটি তিনি তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনেই করে থাকবেন। তবে এ ব্যাপারে সরকার তাঁকে প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবেন। চারা সরবরাহ করবেন, সর্বোপরি, এটি যে কৃষকের জন্য লাভজনক সে বিষয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি আগেই সেরে নেবেন। কৃষক প্রশস্ত আলের ধারে বৃক্ষরোপণ করতে পারেন অথবা যে সকল জলাজমিতে চাষাবাদ হয় না সেসবের ধারে বৃক্ষরোপণের পরামর্শ দিতে পারেন। তৃণ ও আগাছায় আচ্ছাদিত ভূখণ্ড, পশুচারণভূমি, ঘরের আশপাশ ইত্যাদিতে গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তবে কিভাবে গাছ লাগাতে হয়, কি ধরনের সার ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে পরিচর্যা করা আবশ্যক, রুগ্ন গাছকে কিভাবে সারিয়ে তুলতে হয়, ঝড়-বাতাসে, পানির প্রবাহে, মাটি ক্ষয়ে, বন্যায় গাছকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের প্রশিক্ষণদান প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে গুটি কয় কৃষক প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা সহজেই তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন।

অষ্টম অধ্যায়

বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা

রূপ হতে রূপে
বহ চুপে চুপে
ওগো চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথ

৮.১ রোপণ পদ্ধতি

গাছ লাগানোর জন্য বর্ষার আগে স্থান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত এলাকার আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা চাই। জমি নিচু হলে ভরাট করতে হবে। কোথায় কোন গাছ লাগাবেন তার পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রোপণের দূরত্ব স্থির করতে হবে এবং খুঁটি পুততে হবে। বর্ষা শুরুর ১৫–২০ দিন আগে ১.৫×১.৫×১.৫ ফুট (দৈর্ঘ্য× প্রস্থ×উচ্চতা) পরিমাণ গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তের উপরের ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। পরে উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করা হবে। এরপর মজা গোবর বা কম্পোস্ট বা পচা সার ১ কেজি, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ২৫ গ্রাম, এসপি ১৫ গ্রাম ও ইউরিয়া ১০ গ্রাম গর্তে দিয়ে ভালোভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণের উপযুক্ত সময় ১৫ মে থেকে ১৫ আগস্ট। মাটি ভিজা থাকলে সেপ্টেম্বর–অক্টোবরেও চারা লাগানো যায়। সরকারি বা বেসরকারি নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করে চারা লাগাতে হবে। নিচু জায়গায় পলিব্যাগে জন্মানো চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্য পর্যন্ত। শিকড়সহ চারা মেঘাচ্ছন্ন দিনে লাগাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। স্ট্যাম্প চারা লাগাতে হয় মে মাসের প্রথম দিকে। উপকূলীয় এলাকায় বর্ষার পর সেপ্টেম্বর মাসে চারা লাগানো উত্তম।

পলি ব্যাগের চারা রোপণের সময় ব্যাগকে সাবধানে কাটতে হয় যাতে চারার শিকড় কাটা না পড়ে। ব্যাগ সরিয়ে ফেলতেই হবে। তবে খেয়াল থাকে যেনো চারার গোড়ার মাটি খসে না পড়ে। পটের চারার ক্ষেত্রেও এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

গর্তে চারা পোঁতার পর চারপাশ চেপে দিয়ে গোড়ার অংশে মাটি একটু উঁচু রাখা প্রয়োজন যাতে গোড়ায় পানি না জমে। চারা লাগানোর পর একে আলতোভাবে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয় যাতে চারা বাতাসের তোড়ে নুয়ে না পড়ে।

৮.২ রোপণের স্থান

১. **মহাসড়ক ও সড়ক**—মেহগনি, শিশু, মিনজিরি, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, বাবলা, অর্জুন, জারুল, খেজুর, জাম, আম, সেগুন বড়ই,তেঁতুল, বট ও রেইনট্রি

২. **কৃষি খামার**—ইউক্যালিপটাস, শিশু, বাবলা, বকাইন, রেইনট্রি, খেজুর, তাল, খয়ের, ঝাউ, কড়ই, অর্জুন, আকাশমণি, ম্যানজিয়াম।

৩. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান**—মেহগনি, বকুল, উইপিং, দেবদারু, কণকচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নাগেশ্বর, সেগুন, রেইনট্রি, চাঁপা, ঝাউ, কাঞ্চন, নারকেল, সুপারি, আম, লিচু, কাঁঠাল, অশোক, সোনালু, ইউক্যালিপটাস, বটলব্রাশ, জজ্ঞারা ও পেয়ারা।

৪. **রেল সড়ক**—ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, শিশু, বাবলা, খেজুর, তাল, খয়ের, মেহগনি, রাজকড়ই।

৫. **নগরের সড়ক**—কৃষ্ণচূড়া, বকুল, পেল্টুফোরাম, তেলশুর, রাজকড়ই, অশোক, সোনালু, কেসিয়া, নড়ুসা, চাঁপা, মহুয়া, শিশু, আকাশমণি, মেহগনি, নাগেশ্বর, পলাশ, ঝাউ, পাইন।

৬. **বাঁধ**—বাবলা, ইপিল ইপিল, শিশু, খেজুর, তাল, আকাশমণি, রেইনট্রি

৭. **উপকূল**—রেইনট্রি, মান্দার, বাবলা, শিশু, খেজুর, ঝাউ, করমচা, কড়ই, ভেলা, ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, নারকেল, সুপারি, বায়েন, কেওড়া, তাল, হিজল, জারুল, গাব, সোনালু, গর্জন, বট, নিম, ঘোড়া নিম, মিনজিরি, তেঁতুল, ঢাকি জাম, কালোজাম, চাঁপা, বাঁশ, শিলকড়ই, পিটালি।

৮. **বসতভিটে**—আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, শরিফা, বেল, ডিম, আমড়া, নারকেল, সুপারি, কামরাঙা, ডালিম, জামরুল, লিচু, কলা, পেঁপে, ক্রোটন্স পাতাবাহার, ফুল ও সবজি, উত্তরে ও পশ্চিমে উঁচু গাছ, বাঁশ, বেত, দক্ষিণ ও পূর্বে কম উঁচু হয় এমন গাছ।

৯. **নদীনালার পাশে বালি জমি**—শিশু, পিটালি, ছাতিয়ান, কদম, বাবলা, খয়ের, ঝাউ, শিমুল, খেজুর।

১০. **বসতভিটের পাশে নিচু স্যাঁতসেঁতে জমি**—হিজল, মান্দার, পিটালি, অর্জুন, বহেড়া, বট, অশ্বথ, রেইনট্রি, অশোক, ছাতিম, কদম, জারুল, শিমুল, আম, জাম, খেজুর, ইউক্যালিপটাস, বাঁশ, বেত, মূর্তা, হোগলা, পিতরাজ, কালোজাম, কেওড়া, পুনিয়াল, পলাশ, সোনালু, বরুনা, বুহাল, শিশু, চালতা, জলপাই।

১১. **উঁচু অনাবাদী পতিত জায়গা**—আকাশমণি, মিনজিরি, আম, কাঁঠাল, কুল, কাজুবাদাম, ইউক্যালিপটাস, ম্যানজিয়াম।

১২. **পুকুর পাড়**—নারকেল, ইপিল ইপিল, কলা, বাঁশ, খেজুর, তাল, সুপারি

১৩. **কৃষি জমির ধারে**—ডোল কমলি, ফণিমনসা, আনারস, মান্দার

১৪. **গ্রামীণ হাট-বাজার**—বট, পাকুড়, রেইনট্রি, তেঁতুল, মেহগনি, আম, জাম

১৫. **শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক এলাকা**—মেহগনি, বকুল, রেইনট্রি, রাজকড়ই, তেঁতুল, নিম, ইউক্যালিপটাস।

১৬. **পার্ক, মসজিদ, মন্দির, মঠ, গীর্জা, করবস্থান, শ্মশান**—নাগেশ্বর, বকুল, ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, পাতাবাহার, রঙ্গন, রক্তন, পলাশ, বোতলব্রাশ, যুজা, পাইন, চাঁপা, পাম, ঝাউ, অরোকেরিয়া, জবা, শেফালি।

৮.৩ পরিচর্যা

১. চারা রোপণের পর বৃষ্টি না হলে 'ঝরনা' (Shower) সাহায্যে গোড়ায় পানি ছিটাতে হবে।

২. গরু, ছাগলের গ্রাস থেকে বাঁচাতে নিয়মিত প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নয়তো বাঁশ বা লোহা দিয়ে তৈরি খাঁচা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

৩. লক্ষ রাখতে হবে গাছ বেয়ে যেনো কোনো গাছ (লতা) লতিয়ে না উঠে এবং গোড়ায় আগাছা না জন্মায়। জন্মালেও উপড়ে ফেলতে হবে।

৪. শীতকালে গাছের গোড়া ঠাণ্ডা রাখার জন্য মালচিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ গোড়ায় শুষ্ক খড়, লতা-পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি দিতে হবে।

৫. কোনো চারা অল্পদিনের মধ্যে মরে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সবল চারা রোপণ করতে হবে।

৬. গাছের বৃদ্ধির জন্য সময় সময় অর্থাৎ কিছুদিন পর পর সার দিতে হবে।

৭. রোপণের এক মাস পর গাছের ঘোড়ার এক ফুট দূরে চারপাশে ২ ইঞ্চি চওড়া গর্ত খুঁড়ে ১০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে। অবশ্য গর্তে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮. গাছ রোগাক্রান্ত হলে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হলে বনবিভাগ বা উদ্যানবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. দুই থেকে তিন বছর বয়সের গাছে বহু ডালপালা গজাতে পারে। সোজা সবল ডালটি রেখে বাকি ডাল ছেঁটে দিতে হবে। ছেঁটে দেবার সময় ধারালো ছুরি বা কাঁচি ব্যবহার করতে হবে যাতে ডাল কেটে বা চিড়ে না যায়।

১০. গাছ গরু, ছাগলের নাগালের বাইরে উঁচু হলে গাছের গোড়ার খাঁচা সারিয়ে ফেলতে হবে।

নবম অধ্যায়

বন সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনা

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্মের কথা তরুরা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিল।

জগদীশচন্দ্র বসু

৯.১ জনগণ ও সরকারের ভূমিকা

বন বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে বা তাঁদের সঠিক দায়িত্ব পালনে অপারগতার সুযোগে স্বার্থান্বেষীমহল বন লোপাট করতে সক্ষম হয়েছে ও হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় উত্তরাধিকারসূত্রে বসবাসকারী স্থায়ী বাসিন্দারা অন্তর্ভুক্ত বনাঞ্চলে গাছ কাটার পারমিট বা অনুমতিপত্র নেয়। পারমিট ইস্যু করেন জেলা প্রশাসন। দেখা যায় পারমিটধারীর জোতে ১০/১৫টি গাছ থাকলেও সে ব্যক্তি বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাহায্যে শত শত গাছের পারমিট ইস্যু করিয়ে নেয়। জোত পারমিটে গাছের সংখ্যা, কাঠের পরিমাণ ও কাঠ স্থানান্তরে নেবার অনুমতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। সংশ্লিষ্ট পারমিট শিকারি নিজে বা তার পক্ষের কাঠ ব্যবসায়ী সরকারি শ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল থেকেই মূলত কাঠ সংগ্রহ করে। এ কাজ করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকেও সন্তুষ্ট রাখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলে বসবাসকারীরা ছোট ছোট জোতের মালিক হলেও, সরকারি কাঠ আত্মসাতের মাধ্যমে মুনাফা-লুঠেরা বড় বড় চক্রগুলো উপরিলিখিত ছোট জোত মালিককে অর্থের বিনিময়ে হাত করে। এভাবে বছরের পর বছর ধরে পারমিটের বদৌলতে সরকারি বন নির্বিচারে কাটা পড়ছে।

শাল প্রধান অঞ্চলের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে বসতভিটে ও ক্ষেতখামার। সাবেক পাকিস্তান আমলে এই বন ছিলো জমিদারের দখলে। জমিদারি স্বত্ব লোপ ঘোষণার ঠিক আগে এরা জমিদারদের কাছ থেকে খণ্ড খণ্ড জমির পত্তন নেয়। ভুয়া পত্তন গ্রহণকারীর সংখ্যাও কম নয়। এরা ক্রমে ওদের অধিকৃত ভূমির সীমানা বাড়াতে থাকে। ফলে শালবন প্রায় ধ্বংসের পর্যায়ে। এ ছাড়া ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে অনেকে অনেক ভুয়া দলিল করে বনাঞ্চল গ্রাস করে বলে জানা যায়।

সুন্দরবনের আশেপাশের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনে ও বিক্রির জন্য বন থেকে ব্যাপকহারে গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহ করে। এখানে এক শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশ্রয় রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

বন সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব সরকারের। সরকার উপরিবর্ণিত বিষয়ে জোর খবরদারি না চালালে ও প্রকৃত সত্য উদ্ধারে আন্তরিক না হলে এই মূল সমস্যার সমাধান হবে না। এক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা রয়েছে আরো বেশি। জনগণ যদি সচেতন হতো তাহলে মুষ্টিমেয় চোরা কারবারি খামোশ হয়ে যেতো। জনগণকে নানাভাবে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য সরকারকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হবে। বনাঞ্চলে গোচারণ, জুমচাষ ইত্যাদি ব্যাপারেও জনগণ সরকারকে সাহায্য করতে পারে। জনগণকে সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে জনগণের মধ্যে সচেতনতাও যেমন বাড়বে বন সৃজনও তেমন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।

৯.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশে ১১০টি বিদেশী ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বনাঞ্চলের ব্যাপারে কাজ করছে। এদের কর্মস্থল মুখ্যত গ্রামাঞ্চলেই। পল্লীর দরিদ্র জনগণের আয়ের সংস্থান করানোই এদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু পরোক্ষে সামাজিক বনায়নের কাজটি করছে। তাঁরা অনেকটা সফলও হয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব প্রকট। অনেক প্রতিষ্ঠান হয়তো একই ধরনের কাজ করছেন। কাজেই, এতে নূতন মাত্রা যুক্ত হবার সম্ভাবনা কম।

প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করে সামাজিক বনায়নের বহুমুখী প্রয়াসকে সফল করা খুবই সহজ। এ ব্যাপারে সরকার বা এনজিওদের শিখর সংগঠন এডাব উদ্যোগ গ্রহণ করলে সম্ভবত সুফল আশা করা যাবে।

৯.৩ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০–'৮৫) শেষে দেখা যাচ্ছে ৭২০০ একর সরকারি খাস জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেনি। মহাসড়ক, সড়ক ও রেল সড়কে বনায়ন পরিকল্পনা স্থানীয় জনগণের অসহযোগিতার কারণে আংশিক ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পরিকল্পিত ১৩৬১ মাইলের মধ্যে ১১৭৪ মাইলে বন সৃজন সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫–'৯০) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পল্লী বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। লক্ষ্য ছিলো ৩৩,৩০০ একর সরকারি নিচু জমিতে বনায়ন করে খুঁটি, আসবাব, জ্বালানি ও পশুখাদ্যের অভাব মেটানো হবে। এছাড়া বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, রেলপথ ও সমুদ্রোপকূলে ১২৮০ কি.মি. বন সৃষ্টি করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে ৩৬০০ ব্যক্তিগত চারা উৎপাদনকারীকে প্রশিক্ষণ দান করা হবে। এরা নার্সারি গড়ে তুলবে। এ সকল নার্সারি বছরে ১৫২০০০ চারা উৎপাদন করবে।

সরকারি নিচু অঞ্চলে বনাঞ্চল, সড়ক ও অন্যান্য স্থানে বনায়নের কাজে দৈনিক মজুরি প্রদানের ভিত্তিতে স্থানীয় দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে। এদেরকে বনাঞ্চলে অন্যান্য ফসল উৎপাদন করার জন্য ও গোচারণ বা পশুচারণের অধিকার প্রদান করা হবে। এই বনের উৎপাদন থেকে লভ্য অর্থ বনায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগণ, সরকার ও বনবিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আলোচ্য পরিকল্পনায় গাছপালাহীন সরকারি বনাঞ্চল ও নূতন উদ্ধারকৃত জমিতে বনায়নের জন্যেও অপর একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিষয়টি হলো চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের জমিসহ উদ্ধারকৃত ৮৫০০০ একর জমিকে বনায়নের আওতাধীনে আনা হবে। এ ছাড়া, অশ্রেণিভুক্ত সরকারি ২৬১০০০ একর জমিতে বনায়নের ব্যবস্থা করা হবে। এর মধ্যে সদ্য জেগে ওঠা সমুদ্রোপকূলীয় চরও অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণদানের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিতে ছিলো বনায়ন সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যোগাযোগ পদ্ধতি, শিক্ষাদান কৌশল ও প্রমিত মাঠ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

সারা দেশকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার দুই পর্যায়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন স্থির ছিলো—(১) সরকারি বনাঞ্চল ও জনসাধারণের জমির উপর সামাজিক বনায়ন এবং (২) ব্যক্তিগত জমি বা বসতভিটেয় সামাজিক বনায়ন। কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে বন বিভাগ ও বন সম্প্রসারণ বিভাগ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বিষয়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গৃহীত পরিকল্পনার এক তৃতীয়াংশ সাফল্য অর্জিত হয় নি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়নি। কাজেই পরিকল্পনার অধিকাঠামো বিষয়ে কিছু জানানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ সরকারের ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে বন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। লক্ষ্য, উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষণ ও এর উন্নয়ন, বনসম্পদ বৃদ্ধি ও জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন ও পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এডিবি ও নোরাডের সহযোগিতায় সরকার ১৯৯৪–'৯৫ থেকে ১৯৯৮–'৯৯ পর্যন্ত মেয়াদি এই পরিকল্পনা হাতে নেন। এতে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয় ১২৩ কোটি। ১০টি জেলা এই প্রকল্পের অধীনে নেওয়া হয়। জেলাসমূহ হলো চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালি, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর ও বাগেরহাট। এ সকল জেলায় ১৩০০ কিলোমিটার বাঁধ, ৯০০ কিলোমিটার রাস্তা, ২৭০০ কিলোমিটার প্রধান সড়ক ও ৩০০০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক

বনায়ন করা হবে। এ ছাড়া বসতভিটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আশ্রয়কেন্দ্র, সরকারি অফিস-প্রাঙ্গণ ইত্যাদিতে রোপণের জন্য ২,৮০,০০,০০০ চারা বিতরণ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০ জেলার ১৬,০০,০০০ হেক্টর জমি বনায়নের আওতাভুক্ত হবে। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারীরা গাছ বিক্রির ৫০% লভ্যাংশ পাবেন। বাকি ৫০ শতাংশের মধ্যে ভূমির মালিক ১৫%, বনবিভাগ ২০% ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৫% লভ্যাংশ পাবেন। চুক্তি হবে বছরভিত্তিক। প্রয়োজনে বনবিভাগ চুক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে।

৯.৪. জনগণের জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ

সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক পল্লীর জনগণকে বনায়নে ও বন সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বন ধ্বংস হলে কি কি ক্ষতি হয়, বন আমাদের কি কি কাজে লাগে, বন মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে, কোন ধরনের জমিতে কি রকম বৃক্ষ রোপণ করতে হয়, রোপণের জন্য কিভাবে জমি তৈরি করতে হয়, কি উপায়ে চারা উৎপাদন করা হয় ও চারা কিভাবে রোপণ করতে হয়, গাছের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয়, গাছ রোগাক্রান্ত হলে কি করতে হয়, কোথায় যোগাযোগ করতে হয়, কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়, কোন সময় গাছ কাটতে হয়, কাটা গাছ ভালো রাখার জন্য কি করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি। এ সকল প্রশিক্ষণের সঙ্গে নগরবাসীদেরকেও সম্পৃক্ত করতে পারলে ভালো হয়। আঙিনা, বারান্দা বা অলিন্দ, বাড়ির ছাদ, ফুলের টব ও বাড়ির ফাঁকা জায়গায় বনায়নের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নগরবাসীরা ধারণা পেতে পারেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বন ও বনাঞ্চল যে বিশাল অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে সকল শ্রেণির জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার জন্য সার্বিক প্রয়াস গ্রহণ আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো কাজ। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা অহরহ শুনছি। এর গ্রাস থেকে বন ও বনাঞ্চল আমাদেরকে অনেকটা রক্ষা করতে পারে।

BANSDOC Library
Accession No. 17933